POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(আল মায়েদা: ৭৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 19

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 মে, 2023 20 শওয়াল 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যদি কোন ব্যক্তি আত্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে চাঁদা দেয় কিম্বা আমাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজনে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় জেনে রেখো এমন ব্যক্তি জাগতিক খ্যাতি ও নামডাকের অভিলাষী। সেই নামেরই মূল্য আছে যা আকাশে লেখা হয়। কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্দ্ধলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

কার্পণ্য করা থেকে বিরত থাকার এবং সদকা ও খয়রাত করার উপদেশ।

১৪২৭) হযরত হাকীম বিন হাজজাম (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- 'উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। আর সর্বপ্রথম তাদেরকে দাও, যাদের তুমি লালন পালন কর আর উত্তম সদকা সেটিই যা চাহিদা পুরণের পর করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাচনা করা থেকে রক্ষা পেতে চাইবে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন আর যে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করতে চাইবে আল্লাহ্ তা তাকে অমুখাপেক্ষি করবেন।

১৪৩১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাকাত নামায পড়ালেন। তিনি (সা.) এর পূর্বে কিম্বা পরে কোন নামায পড়েন নি। অতঃপর মহিলাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন আর তাঁর সঙ্গে হযরত বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে উপদেশ দান করেন, তাদেরকে সদকা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলে মহিলারা কেউ হাতের বালা, কেউ কানের গয়না নিক্ষেপ করছিল।

১৪৩৩) হযরত আসমা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) আমাকে বলেছেন- বেঁধে রেখো না। (খুলে দাও) অন্যথায় তোমাদের কাছে আসা থেকে আটকে দেওয়া হবে।

* উসমান বিন আবি শিবা আবাদাহর পক্ষ থেকে এই হাদীসটিই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আর এই কথাগুলি বলেছেন- 'গণনা করতে থেকো না, অন্যথায় আল্লাহও তোমাদেরকে গুনে গুনে দিবেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত)

জুমআর খুতবা, ৩১ শে মার্চ, ২০২৩
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আর্থিক কুরবানি কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যদি কোন ব্যক্তি আত্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে চাঁদা দেয় কিম্বা আমাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজনে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় জেনে রেখো এমন ব্যক্তি জাগতিক খ্যাতি ও নামডাকের অভিলাষী। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্য এই পথে পদচারণা করে এবং ধর্মের সেবায় অবিচল থাকে, সে এ নিয়ে মোটেই ভাবিত হয় না। জগতের খ্যাতির কোন মূল্য নেই। সেই নামেরই মূল্য আছে যা আকাশে লেখা হয়। কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্দ্ধলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে। আমার অনেক নিষ্ঠাবান বন্ধু আছে, যাদেরকে তোমরা হয়তো খুব কমই চেন, কিন্তু তারা সব সময় আমার সঙ্গ দিয়েছে। যেমন- আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে, মির্যা ইউসুফ বেগ সাহেব আমার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি তাঁর কথা উল্লেখ করলাম যাতে এভাবে ভাইয়েদের মাঝে পরিচিতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। মির্যা সাহেব সেই যুগ থেকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যখন আমি নিভৃত জীবন যাপন করতাম। আমি দেখেছি, তাঁর অন্তর নিষ্ঠা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, সর্বক্ষণ জামাতের সেবার জন্য তাঁর মধ্যে এক প্রকার উদ্দীপনা কাজ করে। এমনই আরও অনেক বন্ধু আছেন, সকলেই নিজের নিজের ঈমান এবং মারেফাত অনুসারে নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ ভালবাসায় আপ্লুত।

যতক্ষণ দৃঢ় ঈমান অর্জিত না হয় কিছুই সম্ভব নয়

যদিও আমি জানি যে ব্যবহারিক অর্থে ধর্মসেবার সৌভাগ্য ধীর গতিতে লাভ হয়। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে যখন ঈমান দৃঢ় হয়, তদনুরূপ মানুষের ব্যবহারিক কর্মও শক্তি লাভ করে। এমনকি এই ঈমানী শক্তি যদি পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, তবে এমন মোমেন শহীদের মর্যাদায় উপনীত হয়। কেননা কোন বিষয় তাদের পথে অন্তরায় হতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজের প্রিয় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না বা পিছপা হয় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯-৩১০)

নবীগণের জামাতের উন্নতি এবং বিপদাপদ- এরা পরস্পর ভাই-ভাই, একে অপরেরর থেকে তারা পৃথক হতে পারে না।
যখন নবী একা থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে মাত্র দুই-একজন ঈমান আনয়নকারী থাকেন, সেই সময়ও বিপদ আসে এবং নবীদের উন্নতির শীর্ষে উপনীত হওয়ার পরও বিপদ আসে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-বস্তুত তারা (অর্থাৎ সাহাবাগণ) মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, মৃত্যুর মাঝেই তাদের সফলতা নিহিত। এই কারণেই তাঁরা খুব দ্রুত সমগ্র বিশ্বে বিজয়ী হন এবং এমন দাপটের সঙ্গে জয় লাভ করেন যার তুলনা অতীতের কোনও জাতিতে পাওয়া যায় না। এরপর দেখুন বিপদাপদের যুগ দ্রুত অপসারিত হয় নি। বরং দীর্ঘ সময় তা বিরাজ করেছে। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত উমর শহীদ হয়েছেন। হযরত উসমান শহীদ হয়েছেন এবং হযরত আলিও শহীদ হয়েছেন। এবং কারবালার ময়দানে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রায় পুরো বংশ শহীদ হয়ে যায়। অনেকে ভুল বোঝেন। তারা মনে করেন, বিপদাপদ কেবল প্রারম্ভিক যুগেই আসে। কিন্তু একথা সত্য নয়। নবীগণের জামাতের উন্নতি এবং বিপদাপদ- এরা পরস্পর ভাই-ভাই, একে অপরেরর থেকে তারা পৃথক হতে পারে না। প্রারম্ভিক যুগেও আসে এবং উন্নতিও চরম শীর্ষেও পৌঁছেও বিপদ আসে। অনুরূপভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। যখন নবী একা থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে মাত্র দুই-একজন ঈমান আনয়নকারী থাকেন, সেই সময়ও বিপদ আসে এবং নবীদের উন্নতির শীর্ষে উপনীত হওয়ার পরও বিপদ আসে। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) প্রথম দিনও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলে, তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। পরবর্তীতে উন্নতির যুগেও এই বিপদাপদের ধারা অব্যাহত ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবন থেকে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট চিরতরে মুছে গেছে- এমনটি কোনও দিনই হয় নি। আর মুসলমানদের উন্নতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্যাগুলির চিরস্থায়ী সমাধানও কোনও দিন হয় নি। হযরত আবু বাকারও কোনও দিন এমনটি মনে করেন নি, হযরত উসমানও এমনটি মনে করেন নি আর আমাদের জামাতেও কখনও এমনটি মনে করা উচিত নয়। এই বিষয়গুলি ঐশী জামাতের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কখনও কোনও আধ্যাত্মিক জামাত এটি ব্যতিরেকে উন্নতি করতে পারে না।

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৮১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

মুবাল্লিগদের সঙ্গে মিটিং (শেষাংশ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাতের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে মোট সদস্য সংখ্যা কত সেই অনুসারে তাদেরকে সময় দিন। এরপর তাদের যুবকদের প্রতি দৃষ্টি দিন। প্রথমে তাদের সমস্যাবলীর বিষয়ে জানুন, তাদের সঙ্গে বসুন। এরফলে জানতে পারবেন যে, ধর্ম সম্পর্কে তাদের আপত্তি কি কি, তাদের মধ্যে কি কি রক্ষণশীলতা কাজ করছে। কিম্বা অনেকের ব্যবস্থাপনার প্রতি বা বড়দের বিষয়ে অভিযোগ থাকে। বা পরস্পরের প্রতি অভিযোগ থাকে , যার কারণে তারা জামাত থেকে দূরে সরে যায়। এই সব বিষয়গুলির খোঁজ খবর নিয়ে প্রথমে একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করুন যে, কিভাবে সেই সব সমস্যার মুখোমুখি হবেন এবং এর কি সমাধান বের করবেন এবং কিভাবে এর জন্য ভবিষ্যতের কর্মসূচি তৈরী করবেন। এই সব বিষয়গুলি দৃষ্টিতে রাখুন।

মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, বর্তমানে জামাতে আসা উদ্বাস্তু এবং ত্রিশ বছর ধরে বসবাসরত আহমদীদের মাঝে অনেক বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা এখানে দীর্ঘকাল ধরে বাস করছেন, তারা হয়তো নিজেদেরকে একটু উৎকৃষ্ট পর্যায়ের মনে করে। যারা এখানে উদ্বাস্তু বা শরণার্থী হিসেবে নতুন এসেছে আপনার তাদের কাছেও যাওয়া উচিত এবং বোঝানো উচিত। আমি গতকালকেই খুতবায় একথাই বলেছিলাম যে, আমরা এক এবং এক হয়ে থাকতে হবে। একথাই আমি বলেছিলাম এটাই প্রধান বিষয়। তাদেরকে একথাই বোঝাতে হবে যে, আমাদের পিতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা একজনই। আমার মতে কালকে আমি যে কথাগুলি খুতবায় বলেছিলাম সেগুলি আপনাদেরকে কর্মক্ষেত্রে অনেক কাজে দেবে।

এরপর মুরুব্বী সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশ অনুসারে এবছর জানুয়ারী মাস থেকে ‘ মুসলিম সান রাইজ’ পত্রিকাকে ত্রৈমাসিক এর পরিবর্তে মাসি করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এর বিষয়বস্তুও উন্নত মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, এই পত্রিকাটি যখন শুরু হয়েছিল তখন এর উদ্দেশ্য ছিল তবলীগ ও প্রচার। তাই এর বিষয়বস্তু তবলীগ সংক্রান্ত হওয়া উচিত।

মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, এর বিষয়বস্তুর মধ্যেও উন্নতি হয়েছে। এখন এই পত্রিকাটি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ এর মাধ্যমে সমস্ত জামাতের সেক্রেটারীদেরকে পাঠানো হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে থাকা সমস্ত মুবাল্লিগদেরকেও এই পত্রিকাটি পাঠানো হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত তবলীগের ময়দানে এর কোনও প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কেবল পাঠিয়ে দিলেই প্রভাব পড়ে না। সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, এর বিষয়বস্তু কি? এর মধ্যে এমন সব প্রবন্ধ থাকতে হবে যা মানুষের আগ্রহ অনুসারে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য আরও বিষয়বস্তু রয়েছে। আপনাকে অনুসন্ধান করতে হবে। রিভিও অফ রিলিজিয়নস পত্রিকাটির উদাহরণ নিন। আজ থেকে দশ বছর পূর্বে এই পত্রিকাটির ২ হাজার কপিও প্রকাশিত হত না। এখন এটি অন লাইনের মাধ্যমেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছয়। সেই সঙ্গে ত্রিশ হাজার কপি ছাপানোও হচ্ছে। আর এর কাছে পৌঁছয়। সেই সঙ্গে ত্রিশ হাজার কপি ছাপানোও হচ্ছে। আর এর পাঠকও রয়েছে। শুধু নিজেদের লোকেরাই নয়, অন্যরাও এটি পড়ে এবং পড়ার পর নিজেদের ফিডব্যাক দেয়। বড় বড় প্রকাশনা কোম্পানীগুলির সম্পাদক এবং মালিক এই সব মন্তব্য লিখে পাঠায় যে, তারা পত্রিকাটি পড়ছে এবং এর থেকে তারা ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে। তাই এটাও দেখা উচিত যে, প্রবন্ধগুলি আকর্ষনীয় কি না। নিরস দার্শনিক প্রবন্ধ হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের রুচি অনুসারে এতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া উচিত। একজন সাধারণ মানুষকে তবলীগের জন্য সব ধরণের তথ্য প্রয়োজন, একজন মাঝারি মানের মানুষের জন্য কি ধরণের তথ্য উপাত্ত দরকার আর একজন শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য কি ধরণের তথ্য উপাত্ত দরকার, ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে জড়িত এবং ধর্মীয় বিতর্কে অংশ নিতে এমন একজন ব্যক্তির কি ধরণের তথ্য উপাত্ত দরকার এগুলো মাথায় রাখতে হবে। হযত মসীহ মওউদ (আ.) ও বলেছেন, আমি কিছু কিছু বইয়ে কঠিন উর্দু বা কঠিন ভাষার ব্যবহার করেছি। কিম্বা যেগুলিতে দার্শনিক যুক্তি রয়েছে। এর কারণ, যে সব মানুষদের সঙ্গে বিতর্ক ছিল বা মোকাবিলা ছিল, তাদের ধারণা ছিল, আমি কিছু জানি না। তাই এগুলি তাদেরকে বলার জন্য ছিল আর সেই সঙ্গে তবলীগও হচ্ছিল। আর যারা সাধারণ ও জামাতের মানুষ, তাদের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সহজবোধ্য ভাষায় লিখেছেন। তাই আমাদের সামনে সব ধরণের প্রবন্ধ থাকা উচিত। কুরআন করীমের উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। কোনও কোনও স্থানে অনেক দার্শনিক যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা হচ্ছে, আবার অন্যত্র সাধারণ আদেশ দেওয়া হচ্ছে। অতএব, এই পন্থা মেনেই আমাদেরকে পত্রিকা পরিচালনা করার চেষ্টা করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই পত্রিকা যদি মুরুব্বীদের কাছে পৌঁছয় তবে মিশনারী ইনচার্জ সাহেবকে বলুন, এটিকে নিজেদের রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করতে। যাতে জানা যায় যে মুরুব্বীরা পত্রিকা পড়ছে কি না। যদি পড়ে থাকেন, তবে তাদের দৃষ্টিতে কি কি ত্রুটি ধরা পড়ছে? কিম্বা তাদের কাছে জানতে চান যে পত্রিকা কি সেই মানের যা কাউকে দেওয়া যেতে পারে বা এতে আর কি কি উন্নতি করা যেতে পারে? আর মিশনারীদের উচিত কেবল ভুলত্রুটি না ধরে এক্ষেত্রে সহযোগিতাও করা। নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তাদেরকে জানান এবং প্রবন্ধ লিখুন। এতে তাদেরও জ্ঞান বাড়বে। তারা যদি সহজবোধ্য নিজেদের ব্যক্তিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন, তবে তাতে মানুষের জ্ঞান বাড়বে। আর ফিডব্যাকের জন্য সর্বপ্রথম লাইন মিশনারীদের। তারাই আপনাকে ফিডব্যাক দিবে। এছাড়া তবলীগ, ইশাআত এবং তরবীয়ত সেক্রেটারীদের কাছে জেনে নিন যে, তাদের মতে পত্রিকাটিকে কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে আর সেখানে মানুষের মাঝে তবলীগের জন্য কোন ধরণের প্রবন্ধ প্রয়োজন। তাই নিজেদের ইচ্ছে মত প্রবন্ধ লিখবেন না। বর্তমানে মানুষের চিন্তাধারা বদলেছে। যুবকদের চিন্তাধারা ভিন্ন। যে সব অভিবাসীরা এখানে এসেছে তাদের চিন্তাধারাও ভিন্ন হবে। তাই কিছু প্রবন্ধ তাদের রুচি অনুসারেও দিতে হবে। অতএব, ফিডব্যাকের ব্যবস্থা থাকা চায়। যে কোনও কাজ হোক, যদি ফিডব্যাক না থাকে তবে কোনও পরিণাম প্রকাশ পাবে না। সেটা হবে পত্রিকা ছেপে দিয়ে আত্মপ্রসাদ নেওয়ার নামান্তর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া পত্রিকাটি যদি অনলাইন হয় সেক্ষেত্রে ফিডব্যাক আপনারা এমনিতেই পেয়ে যাবেন। কতজন পত্রিকা পড়ছে, কতজন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছে-সমস্ত তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন। এর থেকেই আপনারা জানতে পারবেন যে মানুষ এতে আগ্রহ রয়েছে কি না। এটাও একটা পদ্ধতি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল-ফযল টিমও প্রতি মাসে আমাকে রিপোর্ট পাঠিয়ে জানায় যে কি ধরণের ফিডব্যাক আসছে, কতজন দেখেছে, কতজনের লেখা পছন্দ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। রিভিউ অফ রিলিজিয়ন ও আল হাকাম- এর টিমও আমাকে রিপোর্ট পাঠায়। আপনারাও এই কাজ করতে পারেন।

হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে একজন মুরুব্বী সাহেব বলেন, হারিসবার্গে তাঁর পোস্টিং। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি তো নিজের গ্রামেই রয়েছেন। কিন্তু এমনটি মনে করবেন না যে এখন মা-বাবার কাছেই থাকবেন বা নিজের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই থাকবেন। আপনার বদলিও হতে পারে। আর অন্যান্য সব মুবাল্লিগরাও যেন একথা মাথায় রাখে যে, আফ্রিকাতেও আপনাদের বদলি হতে পারে। একথা ভেবে বসবেন না যে যুক্তরাষ্ট্রে পোস্টিং হয়েছে তো এখানেই থেকে যাবেন। এখনন আমি একটি সেতু তৈরী করছি যার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন মুরুব্বীদের অন্যান্য দেশে বদলি হবে। তবে একথাও মাথায় রাখতে হবে যে, এখানে ইংরেজি ভাষী মুবাল্লিগের সংখ্যা যেন বেশি হয়।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, যে সমস্ত মুরুব্বী আমাকে চিঠি লেখে, তারা উর্দুতে লিখবেন, ইংরেজিতে নয়, ব্যক্তিগত চিঠি হলেও।

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবের কাছে জানতে চান যে, আপনার মতে এই বদলির ফলে লাভ হবে?

মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, অন্যত্র গেলে অভিজ্ঞতার দিক থেকে লাভ হয়।

একজন মুবাল্লিগ বলেন, অনেক সময় আহমদীরা সমাজ মাধ্যমে এমন কিছু পোস্ট করে যা জামাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল, সমস্ত আহমদী সমান নয়। যদি কোনও আহমদী অপর আহমদীর কোনও দুর্বলতার কথা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলে আহমদীরা বলে এক কথা আর করে আর এক। আহমদীদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়েই থাকে। ১০০ শতাংশ আহমদী তাকওয়ার পথে চলে একথা কে বলেছে? আপনাদের ১০০ শতাংশ আহমদীরা তো নামাযও পড়ে না। প্রথমে তাদেরকে নামাযী করে তুলুন। যদি মৌলিক বিষয়গুলিই না থাকে তবে আহমদীদের আপত্তি যথাযথই। তবে সেই আহমদী যদি নিজের এলাকার হয় তবে তার কাছে গিয়ে বোঝান যে, দেখ! এই কারণে জামাতের উপত্তি হয়েছে। তাদের আপত্তি যদি সঠিক হয়,তবে তুমি নিজের সংশোধন কর। অন্যথায় তারা যা বলে বলুক। যদি কারো অন্য কোনও আপত্তি না থাকে তবে তারা গালি দিতে শুরু করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: গতকালকেই একটি পরিবার আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিল। তাদের দাদু হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর যুগে সংবাদ পেয়েছিলেন। আর যে আহমদীর হাত ধরে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন, তিনিই ক্রোধের বশে তাঁর মাথা ফাটিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি এক মৌলবীকে লিখে জানান যে, একজন আহমদী তার সঙ্গে এই আচরণ করেছে। মৌলবী তাকে গালিতে পরিপূর্ণ বইপুস্তক পাঠিয়ে দেয়। সেই ব্যক্তি বলে, আমি তোমার কাছে যুক্তি প্রমাণ চেয়ে পাঠালাম, আর তুমি আমাকে গালি পাঠালে! এটা কোনও কথা হল? এই ঘটনার জেরেই তিনি আহমদী হয়ে যান। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার যারা আপত্তি করে, তারা মানুষেল দুর্বলতা খুঁজে আপত্তি করে। আর আমরাই বা কবে দাবি করলাম যে, একশ শতাংশ আহমদী তাকওয়ার উচ্চ মানে উপনীত?

এরপর ১০ ও ৮ পাতায়..

জুমআর খুতবা

" খোদার পক্ষ থেকে আমিই সেই সংস্কারক যার আগমন এই শতাব্দীর শিরোভাগে নির্ধারিত ছিল, যাতে ধরাপৃষ্ট থেকে বিলুপ্ত ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তাঁরই হাতের আকর্ষণে পৃথিবীকে সংশোধন, তাকওয়া এবং সত্যের পথে টেনে নিয়ে আসি এবং তাদের বিশ্বাসগত ও কর্মগত ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করি।"

(হযরত মসীহ মওউদ)

আরও একটি জামাত রয়েছে যা শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমত অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং দৃঢ় বিশ্বাস থেকে দূরে থাকবে। তখন খোদা তাদেরকেও সাহাবাদের রঙে রঙীন করবেন।'

(হযরত মসীহ মওউদ)

মসীহ্ মওউদ ও পারস্যবংশীয় ব্যক্তির যুগ যেহেতু একই এবং তাদের কাজও এক অর্থাৎ ঈমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাই এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হলো যে, মসীহ্ মওউদই পারস্যবংশীয় ব্যক্তি এবং তাঁর জামা'ত সম্পর্কেই এই وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াতটি।

দ্বিতীয় দল যারা উপরোক্ত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের অনুরূপ তারা হলো মসীহ্ মওউদের দল। কেননা এই দলও সাহাবীদের মতো মহানবী (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার পর হেদায়াত লাভকারী। وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াতে যে এই দলটিকে 'মিনহুম' (তাদের মধ্য থেকে) মর্যাদার অর্থাৎ সাহাবীদের সদৃশ হওয়ার নেয়ামতের ভাগিদার করা হয়েছে।

খোদা তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এই ঈমানের সংস্কার এবং মারেফাতের জন্য প্রেরণ করেছেন।

আজ মুসলমানরা যদি এই সত্য বিষয়টি উপলব্ধি করে অর্থাৎ যে মসীহ্ ও মাহদী আগমন করার ছিল তিনি আগমন করেছেন আর মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক এবং সত্যিকারের দাস ইনিই এবং তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী আবশ্যক এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর বয়আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হলে পৃথিবীতে মুসলমানরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো অন্যথায় তাদের অবস্থা তা-ই থাকবে যা বর্তমানে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের সুবুদ্ধি দিন।

গতকাল ছিল ২৩ মার্চ । আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রেরিত যুগ ইমাম মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীকে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন।

মসীহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ভাষায় সূরা জুমআর আয়াতের তফসীর, মসীহ মওউদ এর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন, ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবীসমহের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য, বিশেষ করে পাকিস্তান, বুর্কিনাফাসো এবং বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত রক্ষা করার জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৪ শে রা মার্চ, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৪ আমান ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমানে আমরা রমযান মাস অতিক্রম করছি। এটি এমন এক মাস যে মাসে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করে আর মু'মিনদের জামাতে এই পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া উচিত। এই মাসে রোযার পাশাপাশি ইবাদতের প্রতিও অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও শোনার প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। যদি রোযার প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে হয় তাহলে ইবাদতের

পাশাপাশি পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও শোনার প্রতিও অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। এছাড়া রমযানের পবিত্র কুরআনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক আছে বা কুরআনের রমযানের সাথে (বিশেষ) সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ (সূরা আল্ বাকারা-১৮৬)। রমযান সেই মাস যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। সেই কুরআন যা সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য হেদায়াতরূপে প্রেরণ করা হয়েছে যা নিজের মাঝে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ধারণ করে, যা সঠিক পথের দিশা দেয় এবং তা ঐশী নিদর্শনাবলীও বটে।

কতক নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অনুসারে, ২৪ রমযানে মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী (অবতীর্ণ) হয়।

(সুনান আল কাবীর লিল বাইহাকি, কিতাবুল জিযিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩১৭, হাদীস-১৮৬৪৯) (আল ইত্তেকান ফি উলুমিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২২)

একইভাবে প্রত্যেক বছর মহানবী (সা.)-এর সাথে জিব্রাইল (আ.) রমযানে পবিত্র কুরআনের একটি পরিক্রমণ সম্পন্ন করতেন বা একবার খতম দিতেন এবং (তাঁর জীবনের) শেষ বছরে দুবার এই পাঠ সম্পন্ন হয়।

(সহীহ আল বুখারী,কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, হাদীস-৪৯৯৮)

যাহোক, রমযানের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অতএব, আমাদেরকেও এই মাসে বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ ও শ্রবণ, এর তফসীর পাঠ ও শ্রবণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এমটিএ'তেও এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচার হয়, দরসও প্রচারিত হয়, এর প্রতিও মনোযোগ দিন।

আমরা যখন পবিত্র কুরআন পাঠের পাশাপাশি এর অনুবাদ ও তফসীর পড়ব এবং শুনব, তখনই আমরা সেসব আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব যা এতে বর্ণিত হয়েছে, এগুলোকে নিজের জীবনের অংশে পরিণত করতে পারব, নিজেদের জীবনকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী গড়তে পারব এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণকারী হতে পারব।

অতএব, আমাদেরকে যদি রমযানের সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে হয় তাহলে আমাদের পবিত্র কুরআন পাঠ এবং এর প্রতি অভিনিবেশ করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেসব স্থানে

মসজিদে দরসের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে দরস শোনা উচিত। পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব; এর সৌন্দর্যাবলীএবং এর সমুজ্জল দলিল-প্রমাণের বিষয়ে এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খুব স্পষ্টভাবে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। কিছুদিন থেকে বিভিন্ন খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে এগুলো বর্ণনা করে আসছি। তাই এগুলো বারবার শোনা, পাঠ করা ও এগুলোর প্রতি অভিনিবেশ করা প্র য়োজন, যেন আমরা সঠিকভাবে জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের আলোকে আজও আমি কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। পবিত্র কুরআন চিরস্থায়ী শরীয়ত– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লার প্রজ্ঞা ও আদেশ-নিষেধ দু ধরনের হয়ে থাকে। কতেক স্থায়ী এবং চিরকালীন আর কতেক সাময়িক এবং সময়ের চাহিদার নিরিখে কার্যকর হয়ে থাকে। যদিও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সেগুলোর মাঝেও স্থায়িত্ব রয়েছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী হলেও প্রকৃতপক্ষে তা স্থায়ী (নির্দেশনা) কিন্তু সেগুলো সাময়িক-ই হয়ে থাকে; উদাহরণস্বরূপ সফরে নামায বা রোযা সংক্রান্ত নির্দেশনা এক রকম এবং মুক্বিম (বা নিজের জায়গায় অবস্থানের) ক্ষেত্রে ভিন্ন, অর্থাৎ সফরকালে নামায জমা করার অথবা কসর (সংক্ষিপ্ত) করার বিষয়ে অনুমতি রয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় নামায সম্পূর্ণ পড়া উচিত। অনুরূপভাবে সফরে রোযা সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। সাধারণ অবস্থায়, মুক্বিম অবস্থায় প্রত্যেক সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ফরয। এরপর তিনি (আ.) বলেন, উদাহরণস্বরূপ আরেকটি আদেশ হলো, মহিলা যেন (বাড়ির) বাইরে যাওয়ার সময় বোরকা পরে বের হয়। এটি এমন একটি আদেশ যা নারীর জন্য বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য। বাড়িতে বোরকা পরিধান করে ঘুরে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। পর্দার আদেশ বাড়ির বাইরে প্রযোজ্য। এরপর এবিষয়টি রয়েছে যে, কাদের সাথে পর্দা করতে হবে এবং কাদের সাথে নয়। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের আদেশাবলী সাময়িক আর সাময়িক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে ছিল। আর মহানবী (সা.) যে শরীয়ত এবং গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন সেই গ্রন্থহলো চিরস্থায়ী ও চিরন্তন শরীয়ত। তাই এতে বর্ণি ত সবকিছু পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ। পবিত্র কুরআন চিরস্থায়ী বিধান, অপরদিকে পবিত্র কুরআন যদি না-ও আসত তাহলেও তওরাত ও ইঞ্জিল মনসুখ (রহিত) হয়ে যেত, কেননা সেগুলো চিরস্থায়ী ও চিরন্তন শরীয়ত ছিল না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২)

অতএব পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব; পবিত্র কুরআনের পথনির্দেশনা সকল পরিস্থিতি ও অবস্থার দাবি পূরণ করে, অত্যন্ত পরিপূর্ণ এবং সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, পর্দার যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি আপত্তিকারীরা এ সম্পর্কে ও আপত্তি করে বসে যে, বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে পর্দা আবশ্যক নয়। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরাও এদের কথায় প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু এরা স্বয়ং এ কথা অকপটে স্বীকারও করছে আর এ সম্পর্কে বড় বড় প্রবন্ধও রচনা করে। আজকাল নারীদের সংগঠনগুলোও আন্দোলন আরম্ভ করেছে। অনেক সময় পত্রপত্রিকাতেও এসব সংবাদ প্রকাশিত হয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কখনো কখনো কুৎসিত অবস্থার অবতারণা করছে আর তাই এখন অনেকে চিন্তা-ভাবনাও করছে যে, (পুরুষ-মহিলার অনুষ্ঠানের পৃথক পৃথক) ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

অতঃপর নিজের আগমনের উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন শরীয়ত হিসেবে কুরআন সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন, এ কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনো! আমার আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? আমার আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো কেবল ইসলামের সংস্কার ও সমর্থন। এর অর্থ এমনটি করা উচিত নয় যে, আমি নতুন কোনো শরীয়ত শেখাতে অথবা নতুন আদেশ প্রদানের জন্য এসেছি কিংবা নতুন কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে। কক্ষনো না! যদি কেউ এমনটি মনে করে তাহলে আমার দৃষ্টিতে সে চরম পথভ্রষ্ট এবং বেদ্বীন। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে শরীয়ত এবং নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন আর কোনো (নতুন) শরীয়ত আসতে পারে না। পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব, এখন এতে তিল পরিমাণ বা বিন্দুবিসর্গও সংযোজন-বিয়োজনের কোনো অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর আশিস ও কল্যাণরাজি আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং হেদায়াতের সুফল ফুরিয়ে যায় নি। তা সকল যুগে সতেজরূপে বিদ্যমান এবং সেই কল্যাণরাজি ও আশিসমালার প্রমাণ দেওয়ার জন্যই খোদা তা'লা আমাকে দণ্ডায়মান করেছেন।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৪৫)

অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষা সবাই অনুধাবন করতে পারে না। কতক বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং তফসীরের দাবি রাখে, যেগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা এই শেষ যুগে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "কুরআন শরীফ এমন এক মু'জিযা যার কোনো দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল না এবং পরবর্তীতেও হবে না। অর্থাৎ পূর্বাপর এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এর আশিস এবং কল্যাণের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত আর তা সকল যুগে তেমনই সুস্পষ্ট ও সমুজ্জল যেভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল। এছাড়া একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কথা তার যোগ্যতা ও দৃঢ়চিত্ততা অনুযায়ী হয়ে থাকে। তার দৃঢ়তা, সংকল্প এবং উদ্দেশ্য যত উন্ন ত মানের হবে তার বাণীও সেই একই মানের হবে। অতএব ঐশী বাণীর মাঝেও একই বৈশিষ্ট্য থাকবে। সাধারণ মানুষ যেমন তার জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলে থাকে, তেমনি ঐশীবাণীর একটি মর্যাদা রয়েছে। যে ব্যক্তির প্রতি খোদার ওহী অবতীর্ণ হয় সে যতটা দৃঢ়চিত্ত হবে সেই মানের বাণী সে লাভ করবে। এক্ষেত্রেও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ওহীরও বিভিন্ন মান রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার বাণীরও বিভিন্ন মান রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর দৃঢ়চিত্ততা, শক্তিসামর্থ্য ও সংকল্পের গণ্ডি যেহেতু অনেক বিস্তৃত ছিল তাই তিনি যে বাণী লাভ করেছেন তাও এমন উন্নত মর্যাদার যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এরূপ মনোবল ও দৃঢ়তাসহ কখনো জন্ম গ্রহণ করবে না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষার গণ্ডি অনেক বিস্তৃত, তা কেয়ামত পর্যন্ত একটি অপরিবর্তনশীল আইন এবং সকল জাতি ও সর্ব কালের †ÿ ‡î c©hvR¨| অতএব খোদা তা'লা বলেন, وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (সূরা হিজর: ২২) অর্থাৎ, আমরা আমাদের ভাণ্ডার থেকে একটি নির্ধারিত পরিমাণে অবতীর্ণ করে থাকি। তিনি (আ.) বলেন, ইঞ্জিলের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই ছিল, তাই ইঞ্জিলের সারাংশ কেবল এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে কুরআন করীমের প্রয়োজন দেখা দেয় সকল যুগের সংশোধনের নিমিত্তে, অর্থাৎ সব যুগের (মানুষের) সংশোধন করা। কুরআন করীমের উদ্দেশ্য ছিল বন্য অবস্থা থেকে মানুষে পরিণত করা, মানবীয় সাধারণ আচরণের উত্তরণ ঘটিয়ে সুসভ্য মানুষ বানানো যেন শরীয়তের সীমারেখা ও নির্দেশাবলী পালনের মাধ্যমে বিষয়ের সমাধা হয়, আর এরপর (তাদেরকে) খোদাপ্রেমী মানুষ বানানো। যদিও শব্দ খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর হাজার হাজার শাখাপ্রশাখা রয়েছে। যেহেতু ইহুদি, প্র কৃতিবাদী, অগ্নিপূজারি এবং বিভিন্ন জাতির মাঝে নানান কুসংস্কারের প্র চলন হয়ে গিয়েছিল তাই মহানবী (সা.) ঐশী জ্ঞানের আলোকে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে সে অনুযায়ী সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (সূরা আরাফ: ১৫৯) অর্থাৎ তুমি বলে দাও, হে মানব সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল। এজন্য কুরআন করীম সেসব শিক্ষামালার সমষ্টি হওয়া আবশ্যক ছিল যা বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে আর সেই সমস্ত সত্যতা নিজের

মাঝে ধারণ করা (আবশ্যক ছিল) যা আকাশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে পৌঁছানো হয়েছিল। অর্থাৎ অবস্থা অনুযায়ী পুরোনো যে শিক্ষামালা ছিল সেগুলোও পবিত্র কুরআন নিজের মাঝে ধারণ করা (আবশ্যক ছিল), আর এগুলো পবিত্র কুরআনে রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আর কুরআন করীমের সামনে ছিল সমগ্র মানবজাতি, কোনো বিশেষ জাতি, দেশ বা সময় নয়। পক্ষান্তরে ইঞ্জিলের দৃষ্টি ছিল একটি বিশেষ জাতির প্রতি। তাই মসীহ্ (আ.) বারংবার বলেছেন, আমি ইসরাঈল জাতির হারানো মেষের সন্ধানে এসেছি। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৬)

অতএব আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশে মহানবী (সা.)-এর এই ঘোষণা যে, আমি সমগ্র বিশ্বের প্র তি প্রেরিত আল্লাহ্র রসূল– এটি একথারও প্রমাণ যে, কুরআন করীম গোটা জগতের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম। প্রাচীন জাতিসমূহের জন্যও ছিল, তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে অবহিত করেছে এবং নতুন আগমনকারীদের জন্যও এতে নির্দেশাবলী রয়েছে। আর এটিই এক চিরস্থায়ী শরীয়ত এবং এটি ছাড়া আর কোনো শরীয়ত নেই যা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআন শরীফ সমগ্র শিক্ষার জ্ঞানভাণ্ডার– একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফ হচ্ছে প্রজ্ঞা ও চিরস্থায়ী শরীয়ত এবং সকল প্রকার শিক্ষার ভাণ্ডার। আর এভাবে কুরআন শরীফের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে এর সুমহান শিক্ষা এবং দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ। যেমন সূরা ফাতেহা, সূরা তাহ্রীম ও সূরা নূর-এ কীরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে! রসূলে করীম (সা.)-এর পুরো মক্কী জীবন ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ। এগুলোর প্রতি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি খোদাভীতির সাথে চিন্তাভাবনা করে তবে সে বুঝতে পারবে যে, কী পরিমাণ অদৃশ্যের সংবাদ মহানবী (সা.) লাভ করেছিলেন। যখন সমস্ত জাতি তাঁর (সা.) বিরোধী ছিল এবং কোনো সহমর্মী ও বন্ধু ছিল না, সেই সময় একথা বলা যে, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ (সূরা ক্বমর: ৪৬) কোনো ছোট বিষয় হতে পারে কি? অর্থাৎ অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে- এটি হলো আয়াতের অর্থ। তিনি (আ.) বলেন, এটি কোনো তুচ্ছ বিষয় হতে পারে কি? উপায়উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে (অর্থাৎ যদি তা থাকে, তবে) এই কথা বলা যেতে পারে যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি (সা.) এরূপ অবস্থায় নিজের সফলতা ও শত্রুপক্ষের লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্বাণী করছেন (যখন বাহ্যত কোনো সাজসরঞ্জাম ছিল না) এবং পরিশেষে হুবহু এরূপই সংঘটিত হয়েছে।”

এই ভবিষ্যদ্বাণী যার উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে তা মহানবী (সা.)-কে খোদা তা’লা মক্কায় প্রদান করেছিলেন আর সেটিও প্রাথমিক অবস্থায় যখন কিনা তিনি (সা.) মক্কায় অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। এরপর এই ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে? আমরা দেখতে পাই যে, আহযাবের যুদ্ধের সময়, (সাধারণত এটিকে আহযাবের যুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরবাস্তবায়ন দেখা যায়;) যখন কিনা কাফেররা বড় সংখ্যায় মুসলমানদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছে। এরপর তিনি (আ.) বলেন, অতঃপর তেরোশ বছর পর প্রতিষ্ঠিত জামা’তের এবং সে যুগের লক্ষণ ও নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী কতই না মহান ও অতুলনীয়! অর্থাৎ তিনি (আ.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী কতই না মহান! বিগত খুতবায় আমি এর কয়েকটি উল্লেখ করেছি যা এখনও কত মহিমার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করছে! তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীর যে কোনো গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করো। মসীহ্’র ভবিষ্যদ্বাণী এগুলোর মোকাবিলা করতে পারে কি? ”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩-৪৪)

কুরআনের প্রত্যেকটি নির্দেশের পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে– এ প্রেক্ষাপটে কুরআন করীমের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এই বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র কুরআনের শিক্ষারই রয়েছে যে, এর প্রত্যেকটি নির্দেশ নিজের মাঝে উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা রাখে। অর্থাৎ এর লক্ষ্য ও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর এজন্য কুরআন করীমের বহু স্থানে এই নির্দেশনা রয়েছে যে, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্র ণিধান, বিচক্ষণতা ও ঈমানের সাথে যেন কাজ করা হয়। ফকাহত হলো বিচার বুদ্ধিকেও কাজে লাগাও আর ঈমানও কাজে লাগাও। ঈমানেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর কুরআন মজীদ ও অন্যান্য গ্রন্থে র মধ্যে এটিই পার্থক্য। অন্য কোনো গ্রন্থ নিজ শিক্ষাকে বিবেকবুদ্ধির সূক্ষ্ম ও স্বাধীন সমালোচনার মুখোমুখি করার সাহসই করে নি।”

তিনি (আ.) ইঞ্জিলের উদাহরণ প্রদানপূর্বক বলেন, ইঞ্জিলের চতুর ও ধোঁকাবাজ পৃষ্ঠপোষকরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, ইঞ্জিলের শিক্ষা যুক্তির বিচারে নিতান্ত প্রাণহীন, অত্যন্ত সতর্ককতার সাথে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে এই বিষয়টির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যে, ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদ এমন রহস্যপূর্ণ বিষয় যে, মানুষের বিবেকবুদ্ধি এর গভীরতা উদঘাটনে অক্ষম। অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের বিষয় যা পর্যন্ত তোমরা পৌঁছতে পারবে না। তাই যখন যেভাবে বলা হয় সেভাবে গ্রহণ করে নাও। কিন্তু এর বিপরীতে কুরআন করীমের শিক্ষা হলো, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ- (সূরা আলে ইমরান: ১৯১-১৯২) অর্থাৎ আকাশসমূহের সৃষ্টি ও পৃথিবীর সৃজন এবং রাত্রি ও দিবসের পালাবদল বুদ্ধিমান লোকদেরকে সেই খোদার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে যার দিকে ইসলাম ধর্ম আমন্ত্রণ জানায়। এই আয়াতে কতই না স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান যে, বুদ্ধিমানরা যেন নিজেদের বুদ্ধি ও মেধাকে কাজে লাগায়। (অতএব) চিন্তাভাবনা করো।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬২-৬৩

পবিত্র কুরআন একটি সংরক্ষিত পুস্তক এবং প্র কৃতির নিয়ম পবিত্র কুরআনের শিক্ষার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)] বলেন, আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (আল-ওয়াকেয়া: ৭৮-৮০)“নিশ্চয় এ এক সম্মানিত কুরআন। একটি গুপ্ত পুস্তক অর্থাৎ, এর মাঝে সুরক্ষিত বিষয় রয়েছে। পবিত্র ব্যক্তি ব্যতিত কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না। ” প্রকৃতপক্ষে এই সমগ্র গ্রন্থটি প্রকৃতির দৃঢ় সিন্দুকে সংরক্ষিত আছে। একথার অর্থ কী যে, পবিত্র কুরআন একটি গুপ্ত গ্রন্থে রয়েছে? অর্থ হলো, এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি গুপ্ত পুস্তকে রয়েছে যাকে প্রকৃতির বিধান বলে। অর্থাৎ কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সাক্ষ্য প্রাকৃতিক বিধানের প্রতিটি অণু -পরমাণু দ্বারা প্রমাণ হয়। এর শিক্ষা ও এর কল্যাণসমূহ কল্প-কাহিনী না যা মুছে যাবে।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:৬৪-৬৫

বরং যে একে বুঝবে এবং পালন করবে সে আল্লাহ্ তা’লার কৃপারাজিও অর্জন করবে। কিন্তু এ-ও স্মরণ রাখা উচিত যে, এর রহস্যাবলী, এর গভীরতা পবিত্র ব্যক্তিদের জন্যই প্রকাশিত হয়। এর জন্য পবিত্র লোকদের সান্নিধ্য হতে কল্যাণমণ্ডিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। এ যুগে এমন ব্যক্তিত্ব একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা’লা প্রদত্ত জ্ঞানের কল্যাণে যা বর্ণনা করেছেন তা আমাদের দেখা উচিত, অভিনিবেশ করা উচিত আর সেই তফসীরই রয়েছে যা তাঁর (আ.) জ্ঞান অনুযায়ী আহমদীয়া জামা’তের সাহিত্যে বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনের নাম ‘যিক্র’ কেন রাখা হয়েছে– এই বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, “পবিত্র কুরআনের নাম যিক্র রাখা হয়েছে কেননা সেটি মানুষের আভ্যন্তরীণ বিধানকে স্মরণ করায়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, কুরআন কোনো নতুন শিক্ষা নিয়ে আসে নি বরং সেই আভ্যন্তরীণ বিধানকেস্মরণ করায় যা মানুষের মাঝে বিভিন্ন শক্তিরূপে অন্তর্নিহিত করা হয়েছে। যেমন ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, বলপ্রয়োগ, ক্রোধ, স্বল্পেতুষ্টি ইত্যাদি। মোটকথা যে প্রকৃতি অন্তর্নিহিত রাখা হয়েছে পবিত্র কুরআন সেটি স্মরণ করিয়েছে। যেমন ***‘ফি কিতাবিম মাকনুন’*** অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিধানে সুপ্ত পুস্তক, যেটি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না– সেটা স্মরণ করিয়েছে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত। পবিত্র কুরআন মানুষের যে প্রকৃতিগত সামর্থ্য রয়েছে সেগুলোকে সঠিক প্রকৃতির পানে পথপ্রদর্শন করে। তাই সে সত্যিকার প্রকৃতি যার থেকে বর্ত মান যুগে বিশেষভাবে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে, পবিত্র কুরআন তা সবিস্তারে বর্ণনা করে। আর এ থেকে দূরে সরে যাবার কারণেই আমরা দেখতে পাই, বর্তমান যুগে কিছু অনৈতিক এবং অপ্রাকৃতিক বিধান তৈরি করার প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ সেটি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, তোমরা পবিত্র কুরআনে গভীর মনোনিবেশ কর, অভিনিবেশ কর। এর ওপর আমল করা তোমাদেরকে মানব প্রকৃতির উন্নত মানদণ্ড দেখাবে। তাই এদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের কুরআন পাঠ করা উচিত এবং বোঝা উচিত। স্বাধীনতার নামে বর্তমানে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদেরও মন-মস্তিষ্ককে যেভাবে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে, এর থেকেও আমরা বাঁচতে পারব। অনেক পিতা-মাতা প্রশ্ন করে, শিশুরা স্কুল থেকে যা শিখে আসে কীভাবে সেগুলোর উত্তর দিব? (এর উত্তর হলো) যদি আমরা চিন্তা করি, তফসীর পড়ি, জামা’তের সাহিত্য পাঠ করি যা পবিত্র কুরআনের আদেশাবলীর আলোকেই করা হয়েছে– তাহলে সন্তানদের প্রশ্নের উত্তরও পিতা-মাতা দিতে পারবেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে এই গ্রন্থে র নাম যিক্র রাখা হয়েছে; যদি এটি পাঠ করা হয় তাহলে তা আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে এবং সেই আত্মিক জ্যোতি যা মানুষের মাঝে খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্ট– তা স্মরণ করাতে পারে। মোটকথা আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনকে অবতীর্ণ করে স্বয়ং এক আধ্যাত্মিক নিদর্শন দেখিয়েছেন। (বারংবার পাঠ করলে এটি তোমাদের স্মরণ করাতে থাকবে।) যেন মানুষ সেসব তত্ত্বজ্ঞান, সত্য ও আধ্যাত্মিক অলৌকিক নিদর্শ নসমূহ জানতে পারে যা তার জানা ছিল না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরআনের

এই চূড়ান্ত লক্ষ্য যা হলো هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (মুত্তাকীদের হেদায়াত দেওয়া)– সেটি বাদ দিয়ে একে শুধুমাত্র কিছু কিচ্ছাকাহিনীর সমাহার মনে করা হয় এবং অত্যন্ত ভ্রূক্ষেপহীনভাবে ও স্বার্থ পরতার সাথে আরবের মুশরিকদের মতো একে ***'আসাতিরুল আওয়ালীন'*** (পূর্ববর্তীদের কাহিনী) আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তিনি (আ.) বলেন, সেই যুগটি ছিল মহানবী (সা.) -এর আবির্ভাবের ও কুরআন অবতীর্ণ হবার যুগ, যখন (কুরআন) পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া সত্যসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছিল। এখন সেই যুগ এসে গেছে যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মানুষ কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী থেকে নীচে নামবে না। এটিই আমরা দেখতে পাচ্ছি! অসংখ্য ক্বারী রয়েছে, অসংখ্য কুরআন পাঠকারী রয়েছে, কিন্তু আমল করার বেলায় নেই!সুতরাং তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, মানুষ কতটা সুললিত কণ্ঠে, সুন্দর কিরাআতে কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে পৌঁছে না; একটুও পালন করে না। এজন্য পবিত্র কুরআন, যার আরেকটি নাম হলো 'যিক্‌র' বা স্মরণিকা, যা সেই প্রাথমিক যু গে মানুষের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও বিস্মৃত সত্য এবং অন্তর্নি হিত শক্তিবৃত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিল, আল্লাহ্ তা'লার সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি- 'ইন্না লাহু লাহাফিজুন' (আমরাই এর সুরক্ষা বিধান করব) অনুসারে এই যুগেও ঊর্ধ্বলোক থেকে একজন শিক্ষক এসেছেন যিনি اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ-এর বিকাশস্থল ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। আর তিনিই সেই (প্রতিশ্রুত ব্যক্তি) যিনি তোমাদের মাঝে (দাঁড়িয়ে) কথা বলছেন। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০)

[তিনি নিজের প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বলেছেন। হায়! মুসলমানরা যদি বিবেকবুদ্ধি খাটাতো এবং যেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা প্রেরণ করেছেন তাঁর কথা শুনতো, নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতো, যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করতো, মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতো, কেবল ফতোয়াবাজি করে ইসলামকে দুর্নাম না করতো, পবিত্র কুরআনের গুঢ়তত্ত্ব বুঝতো! যাহোক, আহমদীদের সর্বদা আত্মবিশ্লেষণে রত থাকা উচিত যে, আমরা কতটা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন করার ও তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করছি বা পালন করছি।

পবিত্র কুরআন প্রকৃত জ্ঞানের সাথে পরিচিত করাতে চায়– এই বিষয়টি বর্ণ না করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যেমন এটা চান যে, মানুষ তাঁকে ভয় করুক, তেমনিভাবে তিনি এ-ও চান যে, মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো সৃষ্টি হোক। শুধু ভয় নয়, বরং জ্ঞানের আলোও যেন সৃষ্টি হয় এবং এর মাধ্যমে যেন তারা ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের ধাপসমূহ অতিক্রম করে। কেন? যেন তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি হয়, চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হয়। কেননা প্রকৃত জ্ঞানের সাথে পরিচয় একদিকে যেমন সত্যিকার খোদাভীতি সৃষ্টি করে, অন্যদিকে এসব জ্ঞানের ফলে খোদার ইবাদতের স্পৃহা জাগ্রত হয়। একজন মুমিন যখন এভাবে চিন্তা করে, প্রণিধান করে, পবিত্র কুরআনের মাঝে মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং পার্থিব যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় রয়েছে সেগুলোকেও পবিত্র কুরআনের আলোকে যাচাই করে তখন তত্ত্বজ্ঞানও সৃষ্টি হয়, খোদাভীতিও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমন কিছু দুর্ভাগাও রয়েছে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিমগ্ন হয়ে গিয়ে নিয়তি বা তকদীর থেকে দূরে চলে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে ই সন্দেহ করে বসে। আর কিছু মানুষ ভাগ্য ও নিয়তিকে স্বীকার করতে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করে বসে। একদিকে একদলজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে খোদা তা'লাকে ভুলে যায়, অপর দল আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হবার নামে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভয় পায় ও একে পরিত্যাগ করে আর বলে, এগুলো ভুল; কিন্তু পবিত্র কুরআন উভয় শিক্ষাই দিয়েছে এবং পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন প্র কৃত জ্ঞানের সাথে এজন্য পরিচিত করাতে চায় এবং এজন্য এদিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে কারণএর মাধ্যমে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় এবং খোদা তা'লাকে চেনার ক্ষেত্রে যত বেশি উন্নতি হতে থাকে ততটাই ক্রমান্বয়ে খোদা তা'লার মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা (হৃদয়ে) সৃষ্টি হতে থাকে। আর মানুষকে তকদীরেরঅধীনে থাকার শিক্ষা এজন্য প্রদান করে যেন আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস ও আস্থার বৈশিষ্ট্য তার মাঝে সৃষ্টি হয় এবং যেন সে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি অর্জন করে যা নাজাত বা পরিত্রাণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৩-২২৪)

এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত জ্ঞানের উৎস ও উৎপত্তিস্থল কুরআন মজীদে এই উম্মতকে দান করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত এই গুঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে আর সেই জ্ঞান লাভ করে যা কেবলমাত্র প্রকৃত তাকওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে, সে সেই জ্ঞান অর্জন করে যা তাকে বনী ইসরাঈলী নবীদের সদৃশ করে দেয়। হ্যাঁ , এই কথা একেবারে সত্য, এক ব্যক্তিকে যে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে সে যদি সেই অস্ত্র ব্যবহার না করে, তবে এটা সেই অস্ত্রের অপরাধ নয় বরং তার নিজের দোষ। বর্তমানে বিশ্বে এই অবস্থাই বিরাজ করছে। মুসলমানরা তাদের কাছে কুরআন শরীফের মতো এরকম অতুলনীয় নেয়ামত থাকা সত্ত্বেও যা তাদেরকে সবরকম পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিতে পারতো ও সকল অমানিশা থেকে বের করতে পারতো– এটিকে পরিত্যাগ করেছে আর এর পবিত্র শিক্ষার কোন ধারই ধারে নি। ফলাফল হলো, তারা ইসলাম থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়েছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৯

সুতরাং যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মুসলমানরা কুরআন করীমের মহান শিক্ষা থেকে বহুদূ রে ছিটকে পড়ে কেবল নামসর্বস্ব মুসলমান রয়ে গেছে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের সাক্ষাৎকার সম্বলিত কিছু সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান অথবা ভিডিও ক্লিপ মানুষ দিয়ে থাকে। এগুলো দেখলে বুঝা যায়, তাদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইতিহাস সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। শুধুমাত্র মে াল্লা-মৌলভীদের কথায় রসূলের সম্মানের নামে অথবা কুরআন বা সাহাবীদের (অবমাননার) নামে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশ থেকে আমাকে একজন লিখে পাঠিয়েছেন, যখন আক্রমণকারীদের দল এসে যখন হামলা করে, তখন তাদের মাঝে এক ছেলে সম্ভবত পাথর ছুঁড়ে মারছিল। আমাদের এই আহমদী সদস্য তাকে বলেন, তুমি কী করছ? এটা কি কুরআনের শিক্ষা বা ইসলাম কি এই শিক্ষা দেয়? আমাকে বলো, কোথায় আছে এই শিক্ষা? আমরা তো কলেমা পাঠকারী। সেই ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তার হাতের পাথর নিচে ফেলে দেয়। সুতরাং মোল্লা-মৌলভী তাদেরকে যেভাবে উস্কে দেয়, তারা সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা এই অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন এবং আমাদের সৌভাগ্য দিন যেন আমরা এই রমযানেও ও এর পরেও কুরআন করীমকে বু ঝি, শিখি এবং এর বিধিনিষেধের ওপর আমল করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিলতা থেকেও নিরাপদ রাখুন।

রমযানে দোয়া করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন; আমি পূর্বেও এই বিষয়ে বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র প্রত্যেক আহমদীকে সবরকম অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন, আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে যারা সংশোধনের অযোগ্য তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিদর্শনে পরিণত করুন যেন অন্যরা (তাদের দেখে) আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধের ওপর আমলকারী হতে পারে। সার্বি কভাবে পৃথিবীর জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে যুদ্ধের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। এদের মাঝে সর্বপ্রথম আমাদের একজন মুরব্বী সিলসিলা ও মুবাল্লেগ সিলসিলা যিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত তার সাথে নিজের ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিতান্ত ই বিনয়ী মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং তিনি সেবা করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

তার নাম মুনাওয়ার আহমদ খুরশীদ সাহেব; তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় জামাতের মুরব্বী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তাঁর বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় ১৯০৩ সালে তাঁর দাদা হযরত মিয়া আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ক রম দীনের মামলার শুনানির জন্য জেহলামে গিয়েছিলেনসেই সময় তিনি বয়আত করেন। মৌলভী খুরশীদ সাহেবের পিতামাতার ঘরে যেই সন্তানই জন্ম নিত সে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতো। যখন তার (খুরশীদ সাহেবের) জন্ম হয় তখন তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আরোগ্যের কোনো উপায় চোখে পড়ছিল না। এমতাবস্থায় তার দাদা মিয়া আব্দুল করীম সাহেব যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত নেন যে, এই সন্তানকে খোদার পথে উৎসর্গ করা হোক। তিনি এর কারণস্বরূপ বলেন, আল্লাহ্‌র প্রয়োজন থাকলে তিনি নিজেই তাকে বাঁচাবেন। যাহোক, এমন সময় গ্রামে একজন ডাক্তার আসেন যিনি দূরবর্তী কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন; তিনি তার চিকিৎসা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে অলৌকিকভাবে আরোগ্য দান করেন। তার শ্বশুর মুহাম্মদ খান দরবেশ সাহেবও তাকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। (স্বপ্নটি হলো) তিনি একটি খুব উঁচু ও উজ্জ্বল মিনারে রয়েছেন, আর এই দরবেশ সাহেবকে বলা হয়েছিল, আহমদীয়াতের মিনারটিকে তিনি খুব উজ্জ্বল করে তুলবেন এবং আহমদীয়াতের অনেক সেবা করবেন; আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুযোগও দিয়েছেন।

জামেয়া থেকে পাশ করার পর তিনি কিছুদিন পাকিস্তানে অবস্থান করেন। এরপর ১৯৮৩ সালে তিনি আফ্রিকার গাম্বিয়ায় চলে যান। এছাড়া সেনেগাল ও এখানকার অন্যান্য দেশেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। গাম্বিয়াতে তিনি আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরে অসুস্থতার কারণে ২০০৫ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন, কিন্তু এখান থেকেও তিনি সেনেগালে মুরব্বী যাওয়া ও রীতিমত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সেনেগাল জামা'তের ব্যবস্থাপনা চালাতে থাকেন। এই সময়কালে, অর্থাৎ ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত তিনি ইউকে জামেয়াতে শিক্ষক হিসাবেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন দারুণ কাজ করেছেন। তিনি অনেকগুলো বয়আত করানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। ৪০ জন সংসদ সদস্য তাঁর মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন

আর তার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর জলসা সালানার ভাষণে 'সেনেগাল বিজয়ী' উপাধীতে তাঁকে ভূষিত করেন। ১৫ জন সংসদ সদস্যকে তিনি জার্মানির জলসা সালানায় নিয়ে আসেন। এছাড়া বিভিন্ন মুরব্বীর জন্য যে PAMA অ্যাওয়ার্ড স্কীমের অধীনে তিনি 'আব্দুর রহীম নাইয়্যার' পুরস্কার প্রাপ্ত হন। আমার নির্দেশে তিনি স্পেনেও যেতেন, সেখানে বসবাসকারী আফ্রিকানদের মাঝে তবলীগ করেছেন আর খুব ভালো কাজ করেছেন। সেখানে অনেকগুলো বয়আত হয়েছে। আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থার অধীনে অনলাইনে কুরআন শিক্ষার ক্লাসও নিতেন, আমৃত্যু তিনি এ কাজ অব্যাহত রাখেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে ও স্ত্রী রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে এখানে যুক্তরাজ্যে মুরব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কানাডা জামেয়ার বর্তমান অধ্যক্ষ দাউদ হানিফ সাহেব তখন গাম্বিয়ার আমীর ছিলেন যখন তিনি আফ্রিকা যান । তিনি বলেন, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং একজন মুবাল্লেগের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি স্কুলে ইসলামিয়াতও পড়াতেন। তিনি বলেন, সেনেগালে তবলীগ করা খুবই কঠিন ছিল। তিনি বলেন, ১৯৮৫ সালের শেষে তাকে সেনেগালের সীমান্তে অবস্থিত ফ্রাফিনি শহরে বদলী করা হয়। উদ্দ্যেশ ছিল এখানে অবস্থান করে সেনেগালে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সফল করা। এটি খুব কঠিন একটি কাজ ছিল। সেনেগাল সরকার কোনো পাকিস্তানিকে ভিসা দিত না। কিন্তু মৌলভী মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেবের মাঝে এই যোগ্যতা ছিলেন যে, তিনি মানুষের সাথে মিলেমিশে যেতেন এবং খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন। তিনি কিছুটা ফরাসি ভাষাও জানতেন। এ কারণে যখন তাকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন তিনি শীঘ্রই সীমান্তে নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, এরপর সেই সম্পর্কের সুবাদে তিনি সেনেগালে আসাযাওয়া আরম্ভ করেন। সেখানকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে তিনি স্ট্যাণ্ডার্ডফরাসি ভাষা শিখতে থাকেন। কেননা সেখানকার স্থানীয় অফিসারদের কাছ থেকে তিনি এ অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন যে, আমি এখানে প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম বারী সাহেবের কাছে বসে ফরাসি ভাষা শিখব। যাহোক, এটি একটি সফলতা ছিল আর এভাবে তিনি কিছুদিন পরপর সেনেগাল যেতে থাকেন। এছাড়া বিশেষ ধরনের একটি পাস ছিল, তা তিনি পেয়ে যান। এর মাধ্যমে গাম্বিয়ার গাড়িতে বসে সেনেগাল যাওয়া যেতো। গাড়িতে করে তিনি (জামা'তের) বইপুস্তক নিয়ে যেতেন এবং তবলীগ করতেন আর এভাবে তিনি অনেকগুলো বয়আত করান। 'কালিক' রিজিয়নে পূর্ব থেকেই কিছু আহমদী ছিল। সেখানকার একজন স্থানীয় মুবাল্লেগ হামেদ আম্বাই সাহেবের সাথে মিলে তিনি কাজ করেন, ফলে সেখানে জামা'ত আরো বিস্তৃতি লাভ করে। সেখানে রাস্তাঘাট ছিল না। আফ্রিকাতে রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা অথবা কাঁচা রাস্তা হয়ে থাকে। আবার অনেক স্থানে রাস্তাঘাটই নেই। দূর বর্তী বিভিন্ন এলাকায় তিনি মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যেতেন। মোটরসাইকেলের রাস্তাও পায়ে হাঁটা সরু পথ ছিল আর এসব পথে ঝোপঝাড় এত কাছে থাকত যে, (মোটরসাইকেলে যাতায়াতের সময়) তার পা রক্তাক্ত হয়ে যেত। কিন্তু এসবের প্র তি কখনোই তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। বরং তিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন।

দাউদ হানিফ সাহেব লিখেন, প্রথম দিকে এটি অনেক কঠিন কাজ ছিল। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তবলীগ করতাম। এরপর ধীরে ধীরে যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং জামা'তের পরিচিত ছড়িয়ে পড়ে আর তিনি যখন মানুষের কাছে একথা পৌঁছাতে আরম্ভ করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য এসেছেন এবং কর্ম কর্তদের নিকটও যখন এ বার্তা পৌঁছাতে থাকেন, তখন বেশ স্বাধীনভাবেই তিনি সেনেগালে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। তিনি নিয়মিত পরিদর্শনে যেতেন। এভাবে 'কালিক' অঞ্চলের অধিকাংশ জনপদে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটে। অনেকগুলো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি মোটরসাইকেলের উল্লেখ করেছি, কিন্তু কোনো কোনো স্থান এমন ছিল যেখানে মোটরসাইকেলও পাওয়া যেত না। সেখানে গরুগাড়ি বা গাধার গাড়িতে করে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন আর বিভিন্ন গ্রামে যেতেন।বর্তমানের কয়েকজন মুবাল্লেগ লিখেছেন, আমরা সেখানে গেলে সেখানকার লোকেরা বলেছে, অনেক আগে মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেব আমাদের এখানে আসতেন। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি আসতেন। তিনি সেখানে গিয়ে থাকতেন এবং তবলীগ করতেন। সেখানকার লোকদের সাথে রাতও কাটাতেন। তাদের খাবার, অর্থাৎ সিদ্ধ চেরী অথবা বাজরা খেয়ে পানি খেয়ে নিতেন, এটিই তার খাদ্য ছিল। আর এরপর তিনি তবলীগ করতে করতে সামনে (অন্য অঞ্চলে) চলে যেতেন। কখনোই তিনি এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি যে, থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে কি না, খাবার পাওয়া যাবে কি না। যেখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানেই তিনি রাত কাটিয়েছেন, খাবার যা পেয়েছেন তা-ই খেয়েছেন। এভাবে তিনি সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তিনি তবলীগও খুব ভালোভাবে করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন স্বপ্ন দেখেন যে, ফরাসি ভাষাভাষী দেশগুলোতে জামা'ত উন্নতি লাভ করছে তখন তিনি যে রিজিয়নে ছিলেন সেখান থেকে বেরিয়ে সেনেগালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাকে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে প্রভাবশালী লোকদের তবলীগ করেন। সেখানকার সংসদ সদস্যদের তিনি তবলীগ করেন, ফলে ১৪ জন সংসদ সদস্য বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করে। জামা'তের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়ে এবং সেখানকার জামা'তও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নেযামে জামা'ত তথা জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ় করার জন্য মোয়াল্লেমদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তালীম, তরবীয়ত ও ট্রেনিং-এর প্রয়োজন ছিল। এ প্রোগ্রাম তিনি বাৎসরিক ভিত্তিতে চালিয়ে গেছেন। মওলানা সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৯৭ সনে তাকে সেনেগালের আমীর নিযুক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে পালন করেন। তিনি (দাউদ হানিফ সাহেব) লিখেন, যুগখলীফার আনুগত্য তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। আমি বাস্তবেই তাঁর মাঝে এটি দেখেছি। অসুস্থ হয়ে এখানে আসেন, ১০ বছর যাবৎ তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তাকে কোনো কাজ দেওয়া হলে তিনি তা তাৎক্ষণিকভাবে করার চেষ্টা করতেন।

তবলীগ করার প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল।সেনেগালের মুবাল্লেগ ওজিহুল্লাহ্ সাহেব বলেন, এখানে আসার পর আমি মুনাওয়ার সাহেবের নাম অনেক শুনেছি। এছাড়া আমি যেখানেই যেতাম সেখানকার মানুষ তাঁর কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতো।

স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেবগণ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একজন স্থানীয় মোয়াল্লেম মাহমুদু তাফসীর মারা সাহেব বলেন, মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেবের মাধ্যমে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আর তিনি আমাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করেছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও ভালোবাসার সাথে আমার তরবিয়ত করেছেন যার ফলে আমি জামেয়া আহমদীয়া ঘানায় শিক্ষার্জন করেছি আর এভাবে জামা'তের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, আমি সুদীর্ঘকাল তার সাহচর্যে কাটিয়েছি। তিনি লিখেন, ইনি সেনেগালিয়ান। খেলাফতের সাথে তাঁর প্রেমময় ভালবাসার সম্পর্ক ছিল আর তিনি আমাকে এ বিষয়েরই নসীহত করে বলতেন যে, খেলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখবে। তিনি বলেন, দ্বিতীয়ত আমি তার মাঝে লক্ষ করেছি যে, তিনি কখনো তাহাজ্জুদ বাদ দেন নি আর আমাদেরকেও তিনি সবসময় উপদেশ দিয়ে বলতেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড় আর তাহাজ্জুদে বিশেষভাবে খলীফাতুল মসীহ্র জন্য দোয়া করো।মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, তিনি খুবই মুত্তাকী ব্যক্তি ছিলেন, পরিশ্রমী ছিলেন, পুরো সেনেগালে তিনি জামাতী সফর করেছেন। তিনি সর্বদা প্রতিটি গ্রামে গিয়ে মুহাম্মদী মসীহ্র বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, আমি এ বিষয়ের সাক্ষী যে, মুনাওয়ার সাহেব যখন জামাতী কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন দিনরাত বা পানাহারের কোন পরোয়াই করতেন না। খোদা তা'লার সাথেও খুব নৈকট্যের সম্পর্ক ছিল, অধিকাংশ সময় তা দেখতাম। তিনি বলেন, একবার কোন এক জামাতী অনুষ্ঠান ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে লোকজন এসেছিল। জনৈক আহমদী সেখানে অসুস্থ হয়ে গেলে ফেরত চলে যেতে চান। তিনি তাকে(ফিরে যাবার) অনুমতি দেন। বাসে জায়গাও পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে যখন বাসে বসানো হচ্ছিলতখন মুনাওয়ার সাহেব একথা বলে যেতে বারণ করেন যে, আপনি এই বাসে বসবেন না, অন্য বাসে বসুন। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম যে এই বাস কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে আর যদি এমনই হয় তাহলে মানুষ বলবে, দেখ! জামাতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। যাহোক পরবর্তীতে তা-ই ঘটে অর্থাৎ যে বাসে যেতে বারণ করেছিলেন সেই বাস দুর্ঘটনার শিকার হয়। সেই ব্যক্তি অন্য একটি বাসে বসে নিরাপদে নিজ ঘরে পৌঁছে যান। এর মাধ্যমেও মানুষের ঈমান অনেক বৃদ্ধি পায়। মানুষের মাঝে তার প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তা এথেকে বুঝা যায় যে, সেনেগালে বিভিন্ন স্থানে তার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিপুল সংখ্যায় অ-আহমদীরাও এতে অংশগ্রহণ করে।

ফাটেক জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওগান ফাই সাহেব বলেন, মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেব আত্মনিবেদনেরযে প্রেরণা নিয়ে কাজ করতেন অন্য কারো পক্ষে এমনটি করা খুবই কঠিন।

এরপর স্থানীয় মোয়াল্লেম জালু সাহেব বলেন, প্রথমবার যখন তিনি সেনেগাল এসেছেন তখন দীর্ঘদিন মুনাওয়ার সাহেবের সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি খুবই মুত্তাকী এবং সাহসী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ ছিলেন। জামাতী সফরের সময় তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে তবলীগি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতেন। একইভাবে তিনি ন্যায়পরায়ণও ছিলেন। জামাতের সদস্যদের সাথে তিনি খুবই আন্তরিক ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতেন।

রাজা বুরহান সাহেব বলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন আর দৈনিক তার ডায়ালাইসিস করতে হতো। একদিন কোনো এক বিয়ের অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, আমি দোকান খুলে ফেলেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দোকান খোলার অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলেন, এখন তো ঘরেই থাকি তাই আমি ঘরের বাইরে টেবিল লাগিয়ে গরমের সময় পানি রেখে দিই, সাথে বই-পুস্তকও রেখে দিই আর এভাবে পথচারীদের পানির প্র য়োজন হলে তাদেরকে পানিও পান

করাই আর বই-পুস্তকও দিয়ে দিই। এভাবে তিনি অবসর বসে থাকেন নি, এই অসুস্থাবস্থাতেও (তবলীগের) নতুন পথ বের করে নিয়েছেন। তাই সেই সমস্ত লোক যারা বলে যে, তবলীগ কীভাবে করবো! তবলীগ করার পথ যদি সন্ধান করা হয় তাহলে অবশ্যই পথ পাওয়া যায় এজন্য শুধু উদ্দীপনা থাকা চাই, আগ্রহ চাই।

এরপর, মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি খুব দ্রুত ভাষা শিখে ফেলতেন। গাম্বিয়াতেও বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার রয়েছে আর তিনি বিভিন্ন ভাষা জানতেন আর তিনি বলতেন, আমাদের তিন জন গাম্বিয়ান মুবাল্লেগ আব্দুল্লাহ্ সাহেব, আব্দুর রহমান সাহেব এবং মুহাম্মদ মুবায়ে সাহেব যারা এখান থেকে পড়াশুনা করে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এরা তিনজন পৃথক পৃথক গোত্রের লোক। এরা একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি এ তিন গোত্রের ভাষাই জানি।

তার স্ত্রী নুসরত জাহান সাহেবা বলেন, সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে তিনি অনেক যত্নবান ছিলেন। খুবই স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খিলাফতের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। ওয়াকফের দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করেছেন। বিরোধ দূর করার ও সন্ধি করার সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা করতেন। খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। আফ্রিকায় জামাতী সফরে গেলে আমাদেরকে বলে যেতেন, আমি কখন ফিরব তা নিয়ে তোমরা চিন্তা করবে না। যখন কাজ শেষ হবে ঘরে ফেরত আসব। তবলীগ-পাগল লোক ছিলেন। স্পেনেও তিনি তবলীগের অনেক সুযোগ পেয়েছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সেখানে যেতেন। এভাবে তিনি পুরোনোদের সাথে যোগাযোগ বহাল করেছেন।

তার ছেলে মুহাম্মদ আহমদ খুরশীদ জামাতের মুরব্বী। তিনি বলেন, তিনি সর্বদা আমাদেরকে এ উপদেশ দিতেন, লোকদের উপকার করা উচিৎ। কেননা এটিও একটি সুন্দর ইবাদত, এতে খোদা সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, আমি তার মধ্যে সর্বদা ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখেছি।

স্পেনের সালমান সালমী সাহেব বলেন, স্পেনে অবস্থানকালে কয়েকবার তার সাথে তবলীগের কাজে বের হবার সুযোগ হয়। বিস্ময়কর বিষয় আমি বার বার দেখেছি, তিনি কোনো (আফ্রি কান) পথচারীকে সালাম দিতেন এবং নিমিষেই তাকে বশ করে ফেলতেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সাথে একটি দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যেত। একই সাথে তিনি বলতেন, সে ওমুক গ্রামের অধিবাসী এবং তার আশেপাশে অমুক অমুক এলাকা রয়েছে। সেখানে আমি গিয়েছি এবং সে অঞ্চলের মানুষ খুবই আন্ত রিক। সেখানকার প্রভাবশালী লোকদেরও চিনতেন। যেহেতু আফ্রিকান ভাষায় কথা বলতেন, এজন্য ঐ ব্যক্তিও তার কথা শুনত আর অবাকও হতো আবার খুশীও হত, আর দু'তিন সাক্ষাতের পর সে জামাতের কাছেএসে যেত, এরপর তাকে [আহমদীয়াতের] বাণী পৌঁছাতেন। তিনি বলেন, প্রথম পরিচয়েই বাণী পৌঁছাতেন না। প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়তেন, এরপর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাক্ষাতে তবলীগ করতেন এবং আহমদীয়াতের সংবাদ দিতেন।

তিনি বলেন, তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সৎ স্বভাবের কল্যাণে ততক্ষণে (তবলীগের) ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যেত, তখন লোকেরা শীঘ্র বয়াতও করতো।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি স্পেনে অনেক কাজ করেছেন। সেখানে তিনি জামা'তও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আহমদীয়াত ও প্রকৃ ত ইসলামের বাণী পৌঁছানোর একটি উন্মাদনা ছিল তার মাঝে। এটিও সত্য যে, একই সাথে তার মাঝে পরম বিনয়ও বিদ্যমান ছিল। আমি যখন তাকে স্পেনে যেতে বলেছি তখন অসুস্থতা সত্ত্বেও কোন ওজর-আপত্তি না করে সেখানে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান।

আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এমন বিশ্বস্ত মুবাল্লেগ ও মুরব্বী দান করতে থাকুন যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে, পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালনকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

আরেকটি জানাযা হচ্ছে মুরব্বী সিলসিলা জনাব ইকবাল আহমদ মুনীর সাহেবের যিনি চৌধুরী মুনীর আহমদ সাহেবের পুত্র। তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে তিনিও মৃত্যু বরণ করেছেন। তার বংশেও আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল ১৮৯৫ সালে তার দাদা চৌধুরী গোলাম হায়দার সাহেবের মাধ্যমে। তিনি ১৯৮৩ সালে জামেয়াতে শিক্ষা সমাপনান্তে কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ দপ্তরের অধীনে কাজ করেন। অতঃপর ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সিয়েরালিওনে ছিলেন। এরপর ফেরত চলে আসেন। এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলাতে কাজ করতে থাকেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্র মের সাথে কাজ করতেন। আল্লাহ্র ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রচিত্তে জামাতের কাজ করতেন। মানুষের সাথে খুবই সু-সম্পর্ক রাখতেন এবং নিষ্ঠাবান প্রকৃতিরছিলেন। মরহুমের স্ত্রী ও তিন ছেলে সন্তান রয়েছে।

মুরুব্বী সিলসিলা আব্দুল ওয়াকিল সাহেব বলেন, তিনি সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে খুবই নরম প্রকৃতির ছিলেন। ক্ষণিকের সাক্ষাতেই বুঝা যেত যে, তার বিনয় কত উঁচু মানের।করাচির নায়েব আমীর সৈয়দ মুনীর আহমদ সাহেব তার সাথে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যে কাজই দেওয়া হতো তাৎক্ষণিকভাবে সে কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতেন। নিয়মিত দফতরে এসে সঠিক পরামর্শও প্রদান করতেন। তিনি বলেন, তার কারণে আমিও নিজের মাঝে সাহস পেতাম। খুবই স্বচ্ছ চিন্তাভাবনার মানুষ ছিলেন। নিজ অঞ্চলের লোকদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল যার কারণে তার কাজে সহজসাধ্যতা তৈরি হয়ে যেত। আর একারণেই চাঁদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাকেই বলা হতো এবং যখন তিনি চাঁদার ব্যাপারে বলতেন তখন মানুষের হৃদয়ে তার কথার প্রভাবও পড়ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ সৈয়্যদা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবার। তিনি মরহুম দরবেশ আব্দুল আযীম সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। দরবেশীযুগে উড়িষ্যা প্রদেশ থেকে বিয়ের সুবাদে আগমনকারী প্রথম মহিলা ছিলেন। মরহুমা দরবেশীর যুগে তার স্বামীর সাথে একান্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে কাটিয়েছেন। নিয়মিত নামায রোযা পালনকারী, দোয়াকারী, পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং অন্যদেরও কুরআন করীম শেখাতেন। অনেক বাচ্চা ও মহিলাকে কুরআন করীম পড়া শিখিয়েছেন। দরবেশীর যুগে যখন আয়-রোজগার কম ছিল তখন জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের দিকে তাকিয়ে না থেকে মুরগী পালন করতেন। জনসেবার প্র তি গভীর প্রেরণা রাখতেন। কাদিয়ানে মহিলাদের দাফন-কাফনে অনেক খেদমত করেছেন। লাশ গোসল দেয়ার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করতেন। যুগ-খলীফার সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। প্রতিটি তাহরীকে অংশগ্রহণ করতেন। মরহুমা ওসীয়্যতকারিনী ছিলেন। তিনি চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। খুরশীদ আনোয়ার সাহেবের সৎ মা ছিলেন। ইনি আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসবিদ দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবের চাচি ছিলেন।

আল্লাহ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, মর্যাদায় উন্নীত করুন। নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

****

অর্থে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে। এই দায়িত্বটি কখনই তাদের হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। ওয়াকফে-নও'কে ধর্মীয় আদর্শে লালন-পালন ও জাগতিক শিক্ষার দিক থেকে নির্দেশনার যোগান দেওয়া সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীদের দায়িত্ব। ওয়াকেফীনকে অবশ্যই তাদের ওয়াক্ফ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং 'ওয়াক্ফ' উপাধি-সর্বস্ব নয়, বরং এটি একটি দায়বোধ ও দায়িত্ব পালনের এক অঙ্গীকার, একটি আজীবন প্রতিশ্রুতি; যার সমকক্ষতায় কোনও পার্থিব বাধ্যবাধকতার কোনই মূল্য থাকে না। এই মানগুলি যদি শৈশব থেকেই মানসপটে সন্নিবেশিত হয় তবেই ওয়াকফে-নও'এর সেক্রেটারীরা সফল হতে পারবেন। আর ওয়াকেফীন'ও তখন বুঝতে পারবেন বাস্তবে তারা 'ওয়াকফ-ই-জিন্দেগী' অর্থাৎ ইসলামের সেবায় আজীবন নিবেদিত।ওয়াকফে-নও সেক্রেটারীদের উচিত ব্যক্তিগত উদাহরণ স্থাপন করা এবং তারা যেসব নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তা অনুশীলন করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি, সেক্রেটারীদের অবশ্যই তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সময় বের করা উচিত এবং পার্থিব আনুষ্ঠানিকতা যেন কখনও তাদেরকে এথেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তাহাজ্জুদ, পাঁচ বেলার সালাত, আল্লাহ্র নৈকট্য প্রার্থনা এবং তাঁর ক্ষমা যাচনা করা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। ওয়াকেফিনের সার্বিক মঙ্গল কামনায় তাদের নিয়মিত দোয়া করতে থাকা উচিত। এসব কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন হলে সেক্রেটারীরা হয়তো বলতে পারবেন যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।আল্লাহ্ তা'লা সকলকে নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করে যথাযথ ভাবে তা পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর ইউরোপ সফর (২০১৬)

ইউরোপে সুদীর্ঘ, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ এক সফর সমাপ্ত করে ২৭ অক্টোবর ২০১৯ শরতের এক বিকেলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ইসলামাবাদে অবস্থিত সদর-দপ্তরে ফিরে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্! হল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর জনগণের কাছে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা প্রচার করতেই হযরত আমীরুল মু'মেনীন মাসোর্ধ কালব্যাপী-এ সফর করেন।

এ সফরকালে হুযূর (আই.)-এর ভাষণ সমূহের সংখ্যা আর এজন্য তাঁর যে ব্যস্ততা, সেটি যেহেতু ছিল ব্যাপক, তাই সেগুলো মনোযোগের সাথেই গণনা করতে হয়েছে। জলসা সালানা সমূহে, মসজিদ সমূহ উদ্বোধনে, বিশিষ্টজন ও সংসদ-সদস্যদের সাথে সংবাদ-সম্মেলনে এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে বৈঠকেও হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.) দিকদিশারী কথাবার্তা বলেছেন। এসব কর্মসূচী ছাড়াও হুযূর (আই.) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায বাজামাত পড়িয়েছেন, জুমুআর খুতবা প্রদান করেছেন এবং স্থানীয় আহমদী ও অতিথিদেরকে সাক্ষাৎকারও দান করেছেন। এসব ঘটনার বিবরণ আল্লাহ্‌র ফজলে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের পাশাপাশি প্রেস ও সংবাদ-মাধ্যমসমূহে, আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স ও আল হাকামসহ বেশ ক'টি পত্রিকা ও চ্যানেলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে আধুনিক সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।এ সফরে হুযূর (আই.) আহমদী মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী ও আমরা যা প্রচার করে থাকি, এর বাস্তব-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। হল্যান্ড ও ফ্রান্স-এর জলসা সালানায় হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.) আমাদেরকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করার বিষয়টি স্মরণ করিয়েছেন এবং এ জামাতের মহান বিজয় সম্পর্কেও অবহিত করেন আর আমরা যেন এ দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন না হই- সে বিষয়েও সাবধান করেন।

এ জলসায় হুযূর (আই.) কেবল আহমদীদের উদ্দেশ্যেই কথা বলেন নি, বরং বিশেষ অধিবেশন সমূহে অ-আহমদীদের সাথেও মিলিত হয়েছেন। এসব বক্তৃতায় হুযূর (আই.) পবিত্র কোরআনের শিক্ষাসমূহের ব্যবহারিক-জ্ঞান ও মহা নবী (সা.)-এর মহান চরিত্র অংকন করে ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরেন। উদাহারনস্বরূপ- হল্যান্ড এর জলসায় হুযূর (আই.) এটি প্রমাণ করেন- ধর্ম কিভাবে "বর্তমান সময়ের সমস্যাদির কারণ হবার পরিবর্তে সমাধান হতে পারে"। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হযরত আমীরুল মু'মেনীন সর্বদাই পবিত্র কোরআন ও মহা নবী (সা.)-এর জীবনী উল্লেখ করে কথাবার্তা বলে থাকেন। ধর্ম, কিভাবে শান্তি বৃদ্ধি করে- সে বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) পবিত্র কোরআনের ১০নং সূরার ২৬নং আয়াতটি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, এতে বর্ণিত আছে যে, "আর আল্লাহ্ আহ্বান করেন শান্তির নীড়ের দিকে, আর তাদেরকেই তিনি সৎপথে পরিচালিত করেন, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট"।হুযূর (আই.) কল্যাণমণ্ডিত সফরকালে, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে বেশ ক'টিমসজিদের উদ্বোধন করেন। হুযূর (আই.) কর্তৃক মোট পাঁচটি মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে, উদ্বোধনের পর তিনি (আই.) মসজিদ নির্মাণের সত্যিকার উদ্দেশ্য এবং ইবাদতকারীদের দায়িত্বাবলী বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। প্রতিবেশী, ধর্মীয়-নেতা, মেয়র, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে হুযূর (আই.) ইসলামের এসব শিক্ষা সবিস্তারে তুলে ধরেন। হুযূর (আই.) প্রদত্ত এসব বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল এই-

মসজিদগুলোকে সামাজিক সংযোগ স্থাপনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে আর তা হবে "শঙ্কাহীন এক স্থান"। ইবাদতকারীদের উচিত, মসজিদে উপস্থিত হয়ে কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের যে দায়িত্ব- সেটিই পালন করা নয়, বরং মানবতার সেবা, বিশেষ করে পারস্পরিক নৈকট্যও হাসিল করা। স্থানীয় আহমদীদেরকে সম্বোধন করে হুযূর (আই.) সর্বদাই সহায়ক প্রতিবেশীদের প্রতি তাদের যে দায়-দায়িত্ব; তা পালন করার জোর তাগিদ দেন।

ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ-এ 'মাহদী মসজিদ'-এর উদ্বোধন কালে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যের মাধ্যমে হুযূর (আই.) মসজিদের যে উদ্দেশ্য তা সুন্দরভাবে তুলে ধরে বলেন:

"এক অদ্বিতীয় খোদার উপাসনায় নিয়োজিত উপাসকদের একত্রে শান্তিতে বসবাস করার উদ্দেশ্যে, এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছে"।

ফ্রান্স ও জার্মানীতে হুযূর (আই.) খুবই হৃদয়গ্রাহী ঐতিহাসিক দু'টো বক্তৃতা প্রদান করেন। মহা নবী (সা.) কী করে সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছিলেন আর মানুষের মাঝে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ও সহিষ্ণুতা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে বিষয়ে ফ্রান্সে ইউনেস্কোর সদস্যবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, বিশিষ্টজন এবং বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষাবিদের উপস্থিতিতে হুযূর (আই.) খুবই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ও দৃষ্টি-বিকাশক এক বক্তব্য প্রদান করেন। ইসলামের আবির্ভাবে " আরবদের মধ্যে প্রথমবারের মত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসভ্য এক সমাজ-ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল"- সে বিষয়টির ব্যাখ্যাও হুযূর (আই.) প্রদান করেন। "মুসলমান বিজ্ঞানী, আবিস্কারক ও দার্শনিক, যারা বিশ্বের উন্নতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন, তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন"- সে বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করতে তথ্য-সমৃদ্ধ বক্তব্য দান করা হয়। হুযূর (আই.) ব্যাখ্যা করেন যে, "শুরু থেকেই ইসলাম শিক্ষা ও মানব-জ্ঞানের অপরিমেয়-মূল্যেও সীমাকে বর্ধিত করার ক্ষেত্রে তাগিদ প্রদান করে আসছে"।

ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ছিল একই ধরনের, যা জার্মানীতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। এখনকার শ্রোতামন্ডলীও শিক্ষাবিদ আর ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা একই ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এ অধিবেশনে "ইসলাম ও ইউরোপ: সভ্যতা সমূহের এক দ্বান্দ্বিক সংঘাত কি ?"- এ বিষয়ের ওপর হুযূর (আই.) জাঁকালো এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় হুযূর (আই.) সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে, 'সভ্যতা' মানব-সমাজের প্রযুক্তি ও বুদ্ধিগত উন্নতিকে বুঝায় আর কোন একটি জাতির 'সংস্কৃতি' যে- সেই জাতির নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে নির্দেশ করে -এতদু'ভয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম যে পার্থক্যটি রয়েছে; তা তুলে ধরে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য দান করেন।

শ্রোতামন্ডলীর কাছে হুযূর (আই.) এটি প্রমাণ করেন যে, ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে ইতিবাচক এক বিষয় আর সেটি পশ্চিমা-সমাজের প্রতি কোন হুমকি নয়। শ্রোতাবৃন্দকে তিনি খৃষ্টধর্মে- প্রচলিত সেই সংস্কৃতিকে সংস্কার করার পরামর্শ দেন, যেটি ইউরোপ থেকে বিদায় নিচ্ছে আর সে স্থলে নাস্তিকতাকে জায়গা করে দিচ্ছে।যেসব অতিথি হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.)-এর এসব কথা শুনেছেন, তাদের প্রতিক্রিয়া ও জবাব থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমাদের ইমাম (আই.) সম্ভাব্য সর্বোত্তম এক পদ্ধতিতেই প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের দরবারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাদের খলীফার নেতৃত্বে মহান যে উদাহরণ উপস্থাপন করছে, অংশগ্রহণকারী সবাই একবাক্যে তারই সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

এ বিষয়ে আমরা আমাদের পাঠকবৃন্দকেএসব অতিথির বিভিন্ন রিপোর্ট ও ভিডিও ফুটেজগুলো দেখে নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কেননা সে অনুষ্ঠানগুলো দেখলে তারা জানতে পান যে, এ জামা'তকে এবং সারা বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ, সহিষ্ণু আর উত্তম এক সমাজের দিকে চালিত করার জন্য কি ভাবেই না তারা হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.)-এর প্রশংসা করেছেন।

একইভাবে আমাদের সবার জন্যই এটি জরুরী যে, হুযূর (আই.) যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, সেটি যেন আমরা শ্রবণ করি, অনুধাবন করি আর চর্চা করি, যাতে প্রকৃত অর্থেই আমরা জানতে পারি যে, আহমদী মুসলমান হওয়ার প্রকৃত অর্থটি কী!

আল্লাহ্ আমাদের সুন্দর এ জামা'তটির সাফল্য জারী রাখুন, ঐশী-শক্তি দ্বারা আল্লাহ্ আমাদের ইমানকে মজবুত করুন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর নেতৃত্বের মাধ্যমেই ইসলামের কাঙ্ক্ষিত সেই বিজয় প্রতিভাত হোক! আমীন!

সাবেক সদরের বিদায় অনুষ্ঠানে হুযুরের ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তাঊয, তাসমিয়া পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান মূলত বিদায়ী সদর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সম্মানে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি তার সদর এর ছয় বছরের মেয়াদকাল সম্পন্ন করেছেন। যদিও তিনি এখন পর্যন্ত খোদ্দামুল আহমদীয়ারই সদস্য আর বর্তমান সদরও গত এক বছর থেকে দায়িত্ব পালন করছেন।

আল্লাহ্‌তা'লার অপার কৃপায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা বিশ্বের সকল দেশেই খুব ভালো কাজ করছেন। বিদায়ী সদর সাহেবকে আমি শুধু একথাই বলবো, এখন তার ওপর জামাতেরও বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে– সেসব জামাতী দায়িত্বের কারণে তার মধ্যে পূর্বে একজন খাদেম হিসেবে সেবার যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। এমনটি মনে করবেন না যে, আমি এখন বিভিন্ন পদ পেয়ে গেছি আর এসব পদের কারণে আমার মর্যাদা অনেক বড় হয়ে গেছে। বরং প্রত্যেক কর্মকর্তার এটি মনে করে উচিৎ, মহানবী (সা.) বলেছেন, "সাইয়্যেদুল কওমে খাদেমুহুম" অর্থাৎ, জাতির নেতা মূলত তাদের সেবক হয়ে থাকে। এই মানসিকতা বা চেতনা যদি আমাদের কর্মকর্তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। আপনারা বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেন, জ্বালাময়ী বক্তৃতাও প্রদান করেন। বড়বড় প্রতিশ্রুতিও দেন আর তারা নাও পড়েন; কিন্তু কার্যত তখনই লাভ হবে যখন আপনাদের চিন্তা-চেতনা সেই কথার সমর্থন যোগাবে। আপনাদের কর্ম সেই বক্তব্যের সমর্থন জোগাবে। কাজেই নতুন সদর সাহেবকেও একথা খেয়াল রাখতে হবে আর প্রত্যেক কর্মকর্তাকে, মোটকথা আমীর থেকে আরম্ভ করে

(২এর পাতার পর.....)

এত উচ্চ মানে প্রতিষ্ঠিত থাকলে খুতবায় আমাকে আপনাদের সংশোধনের কথা বলতে হত না। অনুরূপভাবে কুরআন করীমেও আল্লাহ্ তা'লা বারবার মোমেন হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন কেন দিয়েছেন?কারণ, ঈমানের দৃঢ়তার জন্য সর্বক্ষণ স্মরণ করাতে থাকা জরুরী। এটা আপনাদের কাজ, আর আপত্তি করার তাদের কাজ। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে বলে ঘাবরে যাওয়ার কোনও কারণ নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: শত্রুদের কাজই হল আক্রমণ করা। আপনাদের কাজ হল সেই আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা, বরং তা প্রতিহত করা। সবসময় রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে থাকলে হবে না। যদি এমন কোনও বিষয় থাকে যা সার্বিকভাবে জামাতের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, তবে তার উত্তর দেওয়া দেওয়া জরুরী। অন্যথায় এটা তো স্বাভাবিক বিষয়। লোকে কত কি অনর্থক বলতে থাকে। সে সব কিছুর উত্তর তো আমরা দিতে পারি না। গালির উত্তর তো আমরা মোটেই দিতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করব। কিন্তু যদি কোনও যুক্তির কথা হয় তবে অবশ্যই যুক্তি উপস্থাপন করা উচিত এবং তার উত্তর দেওয়া উচিত। আপনারা কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করুন এবং এমন আপত্তি সমূহের উত্তর সন্ধান করুন। তবে যদি কারোর মধ্যে কোনও দুর্বলতা থাকে, যেমন অমুক পদাধিকারীর ছেলের বিয়েতে নাচগান হচ্ছিল, অমুকের বিয়েতে মিউজিক বাজছিল- এই সব আপত্তির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সেই পদাধিকারীকে বোঝান এবং পরে রিপোর্ট করুন। এই ধরণের ঘটনার রিপোর্ট যখন আমার কাছে আসে, আমি তখন সাধারণত এমন পদাধিকারীদের সরিয়ে দিই। মরকযের কাছে এর সংবাদ থাকা উচিত। তাই আমীর সাহেবকে রিপোর্ট দিন, তাঁর মাধ্যমে মরকযে রিপোর্ট পৌঁছে যাবে। তাই কারো মাঝে যদি দোষত্রুটি থাকে, আর বলা সত্ত্বেও তার সংশোধন না হয় বরং অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে বা কোনও পদাধিকারী নাম জড়িত থাকে, তবে অন্যরা যে শাস্তি পায়, পদাধিকারীরাও একই শাস্তি পাবে। সম্প্রতি কানাডায় আমি দুইজন মুরুব্বীকে সাসপেন্ড করেছি যারা এমন এক মজলিসে উপস্থিত ছিল যেখানে গানবাজনা চলছিল আর তারা সেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে উঠে আসে নি। তাই দেখা যায় যে, মুরুব্বীদের মাঝেও এমন ব্যক্তি থাকে, অন্যদের কথা আর কি বলব?

এরপর একজন মুরুব্বী সাহেব প্রশ্ন করেন, হুযুর আনোয়ার তবলীগের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবলীগের জন্য সোশাল মিডিয়াকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুটা ধন্দ্ব রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তবলীগের ক্ষেত্রে কি কি বিধি নিষেধ রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সব সোশ্যাল মিডিয়া পরিমিত, সেখানে তবলীগের উদ্দেশ্যে গেলে অসুবিধে নেই। অনুরূপভাবে আপনারা নিজেরও কোনও ওয়েবসাইট তৈরী করতে পারেন যেখানে তবলীগ করতে পারেন। কোনও ওয়েব সাইট পরিচিতি লাভ করলে লোকে সেখানেও ভিড় করতে শুরু করে। কিছু মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া উত্তরও দেয়। কিন্তু অনেক সময় নিজস্ব একাউন্ট তৈরী করে সেখানে বিভ্রান্তিকর উত্তর দেওয়া শুরু দেয়। আমি এ জন্যই এটা নিষেধ করেছিলাম। আর তখন তারা নিজের ইচ্ছে মত বিতর্ক শুরু করে দেয়। এরপর মুরুব্বীদের নিজেদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। কেউ বলে তুমি ভুল উত্তর দিয়েছ, এর উত্তর এমন হওয়া উচিত। আপনারা যখন নিজেদের মধ্যেই বিতর্কের সৃষ্টি করবেন, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যদের উপর তার কি প্রভাব পড়বে। এগুলো অনুচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন এবং এর অনুমোদন নিন। এর পর সেই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করুন। এই যে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কাজ হয়ে থাকে, একটির মুখ একদিকে, অন্যটির অপরদিকে- যখন কেউ জানেই না যে কি করতে হবে। তখন প্রত্যেকে নিজের নিজের পাণ্ডিত্য দেখাতে শুরু করে। এগুলো ঠিক নয়। আমি এই জিনিসটাই নিষেধ করেছিলাম। পাঁচ-ছয় মাস পূর্বে কানাডায় আমি একটি ওয়েব সাইট বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেটার কারণ এটিই ছিল। এমনিতে তবলীগের জন্য নিত্যনতুন পথ অনুসন্ধান করা উচিত আর সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগানো উচিত। আমরাও করি। কিছু কিছু অঙ্গ সংগঠনকেও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই মুরুব্বীরাও এর অনুমতি পেতে পারেন, কিন্তু এর জন্য একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা নজিরবিহীন এক সময়ের মধ্য দিয়েঅতিক্রম করছি,যেখানে আমরা কল্পনাতীত ভয়াবহ পরিণামবাহী এক সম্ভাব্য বৈশ্বিক সংঘাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। সাম্প্রতিক এক একান্ত সাক্ষাতের সময় IAAAE-এর ২০২২ সালের বার্ষিক সিম্পোজিয়ামে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে হুযূর আকদাসকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন করার সৌভাগ্যপূর্ণ সুযোগ হয়েছিল। পাঠকদের সুবিধার্থে সেই আলোচনার বিবরণ উপস্থাপিত হল:আমের সফীর:হুযূর! আমরা IAAAE-র সম্মেলনে আপনার ভাষণ শোনার পর অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):কোন্ অর্থে?

আমের সফীর:হুযূর! যদিও আপনি নিয়মিতভাবেই একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে কথা বলেছেন, এই প্রথমবারের মতো আমরা হুযূরকে এমন এক অঘটনের পরবর্তীতে কীভাবে পুনর্নির্মাণ করতে হবে তার একটি ছক সম্পর্কে কথা বলতে শুনলাম। আমি যে টেবিলে বসেছিলাম, সেখানকার মানুষ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আফ্রিকায় জমি কেনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। কেউ কেউ বলছিলেন যে, এখন যেহেতু পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে বলে মনে হয়, আর যদি খোদা না করুন এভাবে পরিস্থিতির অবনতি চলতে চলতে এটি এক নিউক্লিয়ার সংঘাতে রূপ নেয়, তাহলে আমরা এমন ধ্বংসযজ্ঞপূর্ণ এক বৈশ্বিক বিপর্যয়ের মুখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ করেই বা আমরা কতটুকু লাভবান হতে পারবো?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.): সাধারণভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে কেউ অন্তত দুই-তিন মাসের খাদ্য ও পানীয়ের মজুদ রাখতে পারেন।কিন্তু, একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সবচেয়েকঠিন দৃশ্যপটে, যেখানে অত্যন্ত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হবে- আর কীইবা বাকি থাকবে? একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত ছাড়া, কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

সুতরাং, প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে নিউক্লিয়ার সংঘাতের চরম দৃশ্যপটে কী অবশিষ্ট থাকবে। যদিওবা কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী টিকে থাকে। তেজস্ক্রিয়তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরে এমনিতেই নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। মাটির ওপরে হোক অথবা নিচে, তেজস্ক্রিয়তা প্রবেশ করবে, আর স্বাভাবিকভাবে যেখানে মানুষ মৃত্যুবরণ করে, সেখানে উদ্ভিদও মৃত্যুর শিকার হবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বেশ কয়েক বছর ধরে মাটির ওপরের স্তরে তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো মাটিতে শোষিত হলে এমনকি তার নিচের স্তরও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে কয়েক বছর পরে আবার ফসল ফলানো সম্ভব হতে পারে। কয়েক ফুট মাটি সরিয়ে ফেলতে হবেএবং এরপরে নিচের মাটিতে ফসল ফলানো সম্ভব হতে পারে। তবে সেই পর্যায়ে লাগানোর উপযোগী বীজ পাওয়া যাবে কিনা তা-ও দেখার বিষয়। সংক্ষেপে, এই দৃশ্যপটটি এমন ভয়ঙ্কর ও আতঙ্কজনক হতে পারে যে, মানবজাতির পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কে জানে যে, এমন পরিস্থিতিতে কে বেঁচে থাকবে আর কে মৃত্যুবরণ করবে। এ কারণেই, যেমনটি বেশ কিছু সময়পার হয়ে গেল আমি সতর্ক করে আসছি, বিশ্ববাসীর টনক নড়া এবং বোধোদয় হওয়া উচিত।বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বাঙ্কার (পাতাল স্থাপনা) তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে কোনো কোনোটি ১৫ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই সকল বাঙ্কার ক্রয় করছেন, যেগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যেন এটম বোমার আক্রমণ এটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু যদি হাতে গোনা কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি বেঁচে যান আর বাকি সকলে, যাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন নেই, তারা ধ্বংস হয়ে যান তাহলে কীইবা লাভ হবে?খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যতোটুকু সম্পর্ক, বর্তমানে আফ্রিকায় খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি করা হচ্ছে, কিন্তু এমন হতে পারে যে, আফ্রিকা থেকেই আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। আফ্রিকায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় আমরা বিনিয়োগ করতে পারি; কেননা, আফ্রিকা এবং বিশ্বের অন্য এমন যে কোনো অঞ্চল, যা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হবে না, তারই সম্ভাবনা থাকবে বিশ্বের ভবিষ্যৎ খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত হওয়ার।যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, "হে ইউরোপ! তুমি নিরাপদ নও, আর হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও, আর হে দ্বীপবাসীগণ! কোন মিথ্যা খোদা তোমাদেরকে রক্ষা করতে আসবে না। আমি নগরসমূহকে ধ্বংস হতে দেখছি, আর বসতিসমূহকে জনমানব শূন্য পাচ্ছি" তখন লক্ষণীয় যে, এখানে আফ্রিকার উল্লেখ নেই। তাই আমার মন এই সম্ভাবনার দিকে যায় যে, হতে পারে আফ্রিকা মহাদেশ রক্ষা পাবে। এটি একটি চিন্তা যা মনে উদয় হয়, অথবা এমন হতে পারে যে, আফ্রিকার একটি বড় অংশ রক্ষা পাবে। সুতরাং, আমরা আফ্রিকায় বিনিয়োগ করতে পারি, কেননা ভবিষ্যতে, বিশ্ববাসীর খাবারের যোগান দিতে আফ্রিকা সহায়তা করতে পারে।আমের সফীর:হুযূর! আপনি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি আফ্রিকা কীভাবে বিশ্ববাসীকে খাদ্য যোগান দিবে, যেখানে বর্তমানে আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের পরিস্থিতিতে মনে হতে পারে যে, এটি তাদের সাধ্যাতীত?

খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):আফ্রিকায় বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। যে ঘাটতি রয়েছে তা যথাযথ পরিকল্পনা, বিনিয়োগ এবং সততার অভাবের কারণে রয়েছে। যদি যথাযথ পরিকল্পনা এবং সততা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, আফ্রিকায় এক বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে যা বর্তমানে অব্যবহৃত। এ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যথাযথভাবে এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন।

আমের সফীর:হুযূর! আপনি যেভাবে আপনার ওঅঅঅউ-এর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করে অনেক প্রকৌশলী, স্থপতি, ডাক্তার এবং

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প শ ন :

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থাৎ, এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৬)

বলতে ডিএনএ এবং আরএনএ এর মধ্যে রদবদল ঘটিয়ে মানুষের শারিরিক, মানসিক এবং বিশ্বাসগত পরিবর্তনের চেষ্টার অর্থ গ্রহণ করে এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারের দিক নির্দেশনা চেয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার ২০২১ সালের ২৪ শে নভেম্বর এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুরআ করীম কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য হিদায়াত তথা পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন,

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (سورة الحجر:22)

(সূরা হিজর: ২২) অর্থাৎ আমরা বোঝা বহনকারী-সংযোজনকারী বায়ুরাশি প্রেরণ করি, অতঃপর মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ করি, তৎপর আমরাই তোমাদিগকে উহা পান করাই; বস্তুতঃ তোমরা উহার সঞ্চয়কারী নহ।

(সূরা হিজর, আয়াত: ২২)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আপনি এই আয়াতের যে অর্থ করেছেন তা সঠিক। এতে কোনও অসুবিধে নেই। ডিএনএ-র মধ্যে রদবদলের পরিণামে মানবতার ধ্বংস সংক্রান্ত বিষয়টি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রা.)ও অনেক স্থানে বর্ণনা করেছেন। হুযুর (রাহে.)'Revealation, rationality, knowledge and truth' গ্রন্থেও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে মানুষের সৃষ্টিতে এই ধরণের নেতিবাচক রদবদলের চেষ্টা সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল এবং সরকারকে সতর্ক করেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রা.) নিজেদের সময় এই আয়াতের অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যাসমূহেও মানবদেহে এই ধরণের নেতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন- 'এমন মানুষরা যখন রাজত্ব পায়, অর্থাৎ তারা খোদা তা'লার সৃষ্টি শক্তিসমূহকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাসীন হয়, তখন তারা প্রজা ও দেশের সেবা করে তাদের প্রশান্তি ও সুখ সমৃদ্ধি এনে দেওয়ার পরিবর্তে এমন সব পরিকল্পনা করতে শুরু করে যার পরিণামে এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে, এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং এক ধর্মের অনুসারীরা অপর ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে এবং দেশে এক অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে তারা এমন পন্থা অবলম্বন করে যার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবস্থার পতন ঘটে এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যায়। 'হারস' এর আভিধানিক অর্থ ক্ষেত। কিন্তু এখানে হারস' শব্দের অর্থ রূপকভাবে ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা উন্নতির জন্য যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সেই সব পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিবর্তে এমন সব নিয়ম কানুন তৈরী করা হয় যার ফলে সভ্যতা ও অর্থনীতি ধ্বংস হয়, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি না হয়। এভাবে তারা মানব প্রজন্মের উন্নতির পথে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং এমন আইন তৈরী করা হয় যার ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম শক্তিহীন ও দুর্বল হলে পড়ে এবং যে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তারা উন্নতি করতে পারে তা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়।"

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৩-৪৫৪)

অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রাহে.) তাঁর খুতবায় (২৮ জুলাই, ও ১১ই আগস্ট ১৯৭২) সুরা বাকারার ২০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মানুষের জন্য খোদার পক্ষ থেকে দেওয়া বিভিন্ন শক্তি ও সামর্থের অনুচিত ব্যবহার ক্ষতিকর আখ্যায়িত করেন এবং মানবজাতিকে এর পরিণামে তৈরী হওয়া আল্লাহ্ তা'লার বিরাগ সম্পর্কে সতর্ক করেন। হুযুর (রহে.) খুতবাতে নাসের, ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আপনি সেখান থেকে অধ্যায়ন করতে পারেন।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্র থেকে একজন আহমদী প্রশ্ন করে যে, ইসলাম, কুরআন করীম এবং জামাত সম্পর্কে কোন্ সীমা পর্যন্ত প্রশ্ন করার অনুমতি আছে? তিনি আরও বলেন, আমি আমাদের মুরুব্বী সাহেবকে ইসলামের পূর্বে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া এবং হজ্জের সময় মহিলা এবং পুরুষদের একত্রে নামায পড়ার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু মুরুব্বী সাহেব আমাকে সন্তুষ্টিব্যঞ্জক উত্তর দেন নি। অনুরূপভাবে লাজনাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ার বলেছিলেন, 'ধর্মের বিষয়ে কেন এবং কি কারণে- এই প্রশ্ন করবেন না।' - ভদ্রলোক হুযুরের সেই মন্তব্যের উল্লেখ করে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন-

ইসলাম জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশ্ন করার অনুমতি দেয়। যেমনটি বলা হয়েছে-

فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা যদি না জান তাহা হইলে আহলে যিকরকে (কিতাবধারীগণকে) জিজ্ঞাসা কর। (নহল: ৪৪)

কিন্তু কুতর্ক করার জন্য অনর্থক ও অশালীন প্রশ্ন করা থেকে আল্লাত বিরত থাকতে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدہ:102)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদের কষ্টের কারণ হইবে।

(আল মায়েদা: ১০২)

অনুরূপভাবে বলা হয়েছে

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ

তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেই ভাবে প্রশ্ন করিতে চাহ যেভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল?

(আল বাকারা: ১০৯)

সুতরাং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণ প্রশ্ন করার বিষয়ে ভীষন সতর্ক ছিলেন। তারা বলেন, আমরা নিজেরা প্রশ্ন করতাম না, বরং অপেক্ষা করতাম, কোনও প্রশ্নকর্তা এসে রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে প্রশ্ন করুক। যাতে আমরা সেই সব কথা শুনে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারি। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা সাহাবা (রা.) দের এই জ্ঞান পিপাসা এইভাবে দূর করতেন যে, অনেক সময় তিনি হযরত জিবরাইলকে মানবরূপে প্রেরণ করতেন। যার থেকে সাহাবা গণ নিজেদের জ্ঞান পিপাসা নির্বাপন করতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তফসীর)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রশ্ন করার বিষয়ে বলেন- 'অনেক মানুষ আছেন যাদের মনে এক প্রকার সংশয় তৈরী হয়, যেটিকে তারা মন থেকে বের করে না আবার প্রশ্নও করে না। সেই সংশয় ভিতর ভিতর ক্রমশ লালিত পালিত হতে থাকে, ক্রমেই সেগুলি বংশ বিস্তার করতে শুরু করে এবং আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। যখন কোনও বিষয় অবোধ্য ঠেকে আবার প্রশ্ন করারও সাহস হয় না, কিন্তু নিজে থেকেই একটি মতামত তৈরী করে নেওয়া হয়। এমন দুর্বলতা কপটতা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মানুষের নিজের আত্মাকে ধ্বংস করাকে আমি শিষ্টাচার বলে মনে করি না। তবে একথাও সত্য যে, তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে প্রশ্ন করাও যথাযথ নয়। এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

(আল হাকাম, ৭ম খণ্ড, নম্বর-১৩, ১০ই এপ্রিল, ১৯০৩, পৃ: ১)

অন্যান্য কিছু কিছু মানুষ হুযূরের বর্ণিত পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবেন। অন্যান্য আহমদীগণ যাদের এ ধরনের দক্ষতা নেই তারা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হলে কী করতে পারেন? খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):একজন আহমদীর দোয়া করা উচিত যে, এমন দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই যেন পৃথিবী রক্ষা পেতে পারে, আর যদি বা ঘটে যায় তাহলে এর পরবর্তী ক্ষতিকরপ্রভাব থেকে যেন রক্ষা পায়। আর আমরা কী করতে পারি? যখন আমরা আমাদের সামনে অন্ধকার দেখি তখন তা আমাদেরকে অন্যদের কাছে এর পরিণাম বর্ণনা করার কাজে নিয়োজিত করে। এখন কেবল আল্লাহ্ই বিশ্বকে রক্ষা করতে পারেন এবং এইসব মানুষের অন্তরে কিছু সুবুদ্ধির উদয় করাতে, অথবা তাদেরকে বোঝানোর বিভিন্ন প্রয়াসকে ফলদায়ক করতে পারেন। এ কারণেই আমি বিশ্ব-নেতৃবর্গকে বছর দুয়েক আগে পত্র প্রেরণ করেছিলাম এ কথা বলে যে, বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বোধোদয় হওয়া উচিত এবং

তাদের নিজ স্রষ্টাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু, তারা সতর্ক হতে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুবাদিতার কাছে তারা

পরাভূত এবং এখন কেবল আল্লাহ্র রহমতই তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।তবে আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কেউ শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে দাবি করতে পারেন না যে, তিনি জানেন কী ঘটতে চলেছে। আমরা কেবল দোয়া করতে পারি, যদি এটাই আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করেন। আর যদি আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ এমন করুন, বিশ্ব জুড়ে মানবতার বৃহৎ অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মতো এমন বৃহদাকার ধ্বংসযজ্ঞ যেন টলে যায়।

আমের সফীর:আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোভিড-এর কারণে কিছু মানুষ তাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন এনেছেন এবং তারা হয় খোদা তা'লার আরও নিকটবর্তী হয়েছেন, অথবা অন্তত তাদের পরিবার এবং জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলোকে তারা পূর্বে উপেক্ষা করছিলেন, সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। একটি বৈশ্বিক সংঘাত কি একটি সতর্কবাণী বা একটি যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে সেই ধরনের ভূমিকা পালন করবে?

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.):এটি নিঃসন্দেহে একটি সতর্কবাণী। এমন পরিস্থিতিতে এমন মানুষ রয়েছেন যারা আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসেন। আর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 11 May, 2023 Issue No.19

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেককে স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্‌তা'লার কৃপা বলেই তিনি তাকে সেবার তৌফিক দিয়েছেন, বস্তুত এটি কারো কোন হক বা অধিকার নয়। কাজেই এই কৃপাকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন।

কায়েদগণও এখানে উপবিষ্ট আছেন–তাই খোদ্দামুল আহমদীয়ার বরাতে একথাও তাদেরকেও বলে দিচ্ছি যে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনেক বড় একটি কাজ হল, আহমদীয়া খিলাফতের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আর এজন্য তারা অঙ্গীকারও করেন। আর খিলাফতের হিফাযত বা সুরক্ষা বলতে শুধুমাত্র উমুমীর ডিউটি দেওয়া বা হিফাযতে খাস এ ডিউটি দেওয়াই নয়।এই কাজ তো অন্যরাও করতে পারে। সত্যিকার হিফাযত হল, যুগ খলীফার বাণী বা কথা প্রচার করা, এর ওপর আমল বা অনুশীলন করা আর এর ওপর অনুশীলন করানো এবং নব প্রজন্মের তত্বাবধান করা। কেবলমাত্র মুখেমুখে এই দাবী করা যে, আমরা ডানেও লড়বো, বামেও লড়বো আর অগ্রে-পশ্চাতেও লড়বো।

আসলে এটি লড়াই করার বিষয় নয়। বর্তমান সময়ের লড়াই বা সমসাময়িক জিহাদ হল, খলীফার নির্দেশের ওপর আমল করা আর এটিই মূল কাজ যা খোদ্দামুল আহমদীয়াকে করতে হবে। এটিপ্রত্যেক কায়েদ, যয়ীম, নাযেম, মোহতামীম এবং সদর সাহেবের কাজ। অতএব, এ বিষয়টি সদা মনে রাখবেন, যেসব কথা বলা হয় বা যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়–আপনারা আমার বিভিন্ন খুতবাও শোনেন, বক্তব্যও শোনেন–এর ওপর আমল করুন আর এগুলোর ওপর আমল করান। আর এক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শ উপস্থাপন করলে অন্যরাও এর ওপর আমল করার চেষ্টা করবে। আমার স্মরণ আছে, আমার খিলাফতের শুরুর দিকে মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব আমাকে লিখেছিলেন, খলীফাদের বিভিন্ন খুতবা ও বক্তৃতার সংকলন ছাপা হয় কিন্তু তা তাঁদের তিরোধানের পর ছাপা হয়– অথচ এগুলো তাঁদের জীবদ্দশায় ছাপানো উচিৎ। তিনি তার ইচ্ছা ব্যক্ত করে একথা লিখেছিলেন। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা হল, পঞ্চম খিলাফতের তাজা খুতবাগুলো যেন প্রতিবছর সাথে সাথে ছাপা হয়। তার কথা ঠিক ছিল তাই আমি এর অনুমতি দিয়ে দিই। আল্লাহ্‌তা'লা আহমদীয়া জামাতের খলীফাদের মধ্যে এবং ভবিষ্যতেও খলীফা হতে থাকবেন–প্রত্যেকের জন্য একটি যুগ নির্ধারিত রেখেছেন আর প্রত্যেককে সেই যুগের চাহিদার নিরিখে তিনি স্বয়ং (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লা) পথনির্দেশনা দিচ্ছেন আর বর্তমান যুগের চাহিদা অনুসারে যুগ খলীফাকে পথনির্দেশনা দিচ্ছেন। তাই সেই যুগ যখন শেষ হয়ে যায় আর নতুন খলীফা নির্বাচিত হন আর নতুন খলীফাকে যখন আল্লাহ্‌তা'লা এ সম্মানে ভূষিত করেন তখন পুরনো পুস্তক না ছাপিয়ে আল্লাহ্‌ যেভাবে (সমসাময়িক চাহিদা অনুসারে) পথনির্দেশনা দেন সে অনুযায়ী চলতে হবে।

একথা ঠিক যে, (পুরনো বক্তব্য ইত্যাদি থেকে) অনেক ঐতিহাসিক অথ্য-উপাত্তও পাওয়া যায়, বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদিও পাওয়া যায়–তাই সেগুলো ছাপানো উচিৎ। কিন্তু আমলের জন্য আবশ্যক হল, যুগ খলীফার কথা শোনা এবং সে অনুযায়ী অনুশীলন করা। (খলীফার) এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই ছিল বা ঐ ছিল–এমনটি বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা নিজেদের মধ্যে আলাপ চারিতার সময় বলে বসে যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের একথা বা এই বাক্য বলার উদ্দেশ্য ছিল এটি। যদি উদ্দেশ্য এটি হয়ে থাকে বা যদি ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় হয় তাহলে খলীফায়ে ওয়াক্ত উপস্থিত আছেন তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। আর যদি পূর্ববর্তী খলীফাদের কথা হয় আর তাঁদের কথার মর্ম অনুধাবনে সমস্যা দেখা দেয় তাহলে এর সমাধান দেওয়া এবং এর ব্যাখ্যা করাও যুগ খলীফার কাজ। অথবা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর কোন উদ্ধৃতি বা তাঁর কোন কথার ব্যাখ্যা কি হবে? এই কাজ কোন কর্মকর্তার নয়। এর ব্যাখ্যা কি হবে সে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যুগ খলীফার কাজ। কাজেই খোদ্দামুল আহমদীয়া সর্বদা মনে রাখবেন, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা সদা স্মরণ রাখবেন, আপনাদেরকে যুগ খলীফার কথামালার প্রতি দেখতে হবে, তাঁর কথা শুনতে হবে আর সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। অতীতে কি উদ্দেশ্য ছিল এবং আগের কথা নিয়ে টানা হেঁচড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌তা'লা যতদিন উত্তম মনে করেন একজন খলীফাকে জীবন দান করেন আর তাঁর কাজকে জারি রাখেন আর তিনি যখন উত্তম জ্ঞান করেন তখন একটি যুগের যবনিকাপাত ঘটে এবং পরবর্তি যুগ আরম্ভ হয়। কাজেই এই বাস্তবতাটি প্রত্যেক কর্মকর্তাকে অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিৎ। আর বিশেষভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজ হল, খিলাফত ব্যবস্থাপনার সুরক্ষার দায়িত্ব যেহেতু তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত তাই সুরক্ষা বিধানের জন্য আবশ্যক হল, নিজেদের যুবকদের মাঝে এবং নিজ সন্তানদের মাঝে এই চেতনা সৃষ্টি করা যে, তোমাদেরকে যুগ খলীফার কথা শুনতে হবে এবং এর ওপর আমল করতে হবে। আর এমন কাজই আপনাকে খিলাফতের সুরক্ষার যোগ্য করে গড়েতুলে এছাড়া বাকি সব কিছুই বুলি সর্বস্ব। অতএব, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে সত্যিকার অর্থেই খিলাফতের সুরক্ষা বিধানের তৌফিক দান করুন আর আপনারা যুগ খলীফার সত্যিকার সাহায্যকারীদের দলভুক্ত হোন। যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর বা সাহায্যকারী হাত হোন। আর আহমদীয়া খিলাফতের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে–সত্যিকার অর্থেই এর সুরক্ষকারী হোন। আর যেমনটি আমি বলেছি, যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এর ওপর আমল করুন আর আমল করানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করুন আর তা প্রচার করুন–তবেই এটি সম্ভব। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের আন্তর্জাতিক রিফ্রেশর কোর্স।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.)-এর কল্যাণমণ্ডিত দিকনির্দেশনায় বিশ্বব্যাপী ওয়াকফেনও সেক্রেটারীদের আন্তর্জাতিক রিফ্রেশার কোর্স গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ রবিবার চার দিন পর্যন্ত টিলফোর্ডের ইসলামাবাদস্থ আইওয়ান-ই-মাসরূর হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ ৩৬টি দেশের প্রতিনিধিত্বমুলক অংশগ্রহণে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌! পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৩৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মা, কন্যা মরিয়মের জন্মের পূর্বে কীভাবে তাঁর সন্তানকে আল্লাহ্‌র সেবায় উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।জামা'তের ভবিষ্যত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সুরক্ষার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রাহে.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম আহমদীয়াতের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম উপায়ে পরিবেশন করার জন্য যথাসম্ভব ওয়াকেফিনকে প্রস্তুত করা। আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের অনেকেই এখন জামা'তের খেদমত করছেন। এক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের ওয়াকফে-নও সেক্রেটারীদের ওয়াকীফেনে-নও'দের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক শিক্ষাগত উন্নতির যত্ন নেওয়ার সবিশেষ গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই হযরত আমিরুল মোমিনিন (আই.) ওয়াকফে-নও স্কীমে অংশগ্রহণকারীদেরকে যেসব নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, ওয়াকেফীনদের সুস্থ ও সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য যারা দায়বদ্ধ সর্বদা তাদের হুযূর (আই.) প্রদত্ত সেই সব দিকনির্দেশনা যথাস্থানে পৌঁছানো ও কার্যকর করা অবশ্যই উচিত।

ওয়াকফে-নও প্রকল্পের উদ্বোধনের পর থেকে বেশ কয়েকটি দেশে জামেয়া আহমদীয়া খোলা হয়েছে আর এসব জামেয়া থেকে অনেক সংখ্যক ওয়াকফে-নও শিক্ষা গ্রহণ করে ধর্মপ্রচারক তথা মুরুব্বী-মুবাল্লেগ হয়ে জামা'তের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে সেবা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বেশকিছু সংখ্যক ওয়াকেফিন জামেয়া থেকে মিশনারি-ধর্মপ্রচারক তথা মুরুব্বী-মুবাল্লেগ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে প্রতি বছরই বের হচ্ছেন, তবে চিকিৎসক এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তাও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।'ওয়াকফে-নও'-এর সকল কর্মী ও সেক্রেটারীগণ, অন্য যে কোনও কিছুর আগে এ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নিজস্ব ব্যক্তিগত কর্তব্য সম্পাদন করছে। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা নামাযে নিয়মনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নফল নামাযের প্রতিও মনোযোগ দিচ্ছেন। সর্বাগ্রে নামায প্রতিষ্ঠিত না রাখলে, কিছুই সম্ভব না। জগতকে আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ করতে হলে নামায কায়েম রাখা এবং কঠোর পরিশ্রম করে যাওয়া; এ দু'টোকে সমন্বিতভাবে পালন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।ওয়াকফে-নও'এর সকল সেক্রেটারীদের মনে রাখা উচিত যে, আস্থাপূর্ণ মহান এক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, আর তা হল ওয়াকেফিনদের বাবা-মা তাদের সন্তানদের ইসলামের সেবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে উৎসর্গ করেছেন তা রক্ষার্থে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও গাইড করা।সেক্রেটারীরা যদি সত্যিকারের ইসলামিক মূল্যবোধ অনুশীলন করে তবেই তারা সত্যিকার

(শেষাংশ ৮ এর পাতায়.)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir